Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

শ্রমজীবী শ্রেণি নিজেদের বিকাশের গতিপথে, প্রচলিত নাগরিক সমাজকে নিজেদের সাংঘিক সমাজের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবে। সেই অভীষ্ট সাংঘিক সমাজ প্রতিটি শ্রেণি এবং তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের বিলুপ্তি ঘটাবে। তথাকথিত রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটবে, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বন্দ্বের প্রাতিষ্ঠানিক দ্যোতনা।

—কার্ল মার্কস

গণবার্তা

সম্পাদকীয় ১
মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজ আপাত-দৃষ্টিতে কঠিন.....চলতে হবে ১
দেশে-বিদেশে ২
কর্ণাটকের নির্বাচন—একটি সমীক্ষা ৩
কলকাতায় মার্কসের জন্মদিবস.... ৪
তৃণমূলের হাত ধরে বাড়ছে বিজেপি ৫
মণিপুরে জাতিদাঙ্গা বেড়েই চলেছে ৬
কর্ণাটকের নির্বাচন ফ্যাসিবাদী বিজেপি'র বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের সূচনা ৭
নির্বাচন কমিশনে আরএসপি'র ডেপুটেশন ৮

70th Year 31th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 27th May 2023

সম্পাদকীয়

মোদির অসুদ্দেশ্য

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে নবনির্মিত সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বহুত্ববাদী ধর্ম সম্প্রদায় ভাষা জাতপাত ধনী দরিদ্র নিরপেক্ষ সংবিধান ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অপহ্নব ঘটাবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণ মন্ত্রোচ্চারণ, গেরুয়াধারী সাধুদের সঙ্গে সভাগৃহে বিচরণ, চোলরাজাদের অনুকরণে রাজদন্ড সেঙ্গল ধারণ, কিছু অনুচর আমলা প্রচার মাধ্যমের বশংবদদের হের হিটলারের বদলে জয় মোদী চিৎকার। এভাবেই যেন কোন সম্রাটের অভিষেক দেখতে চলেছে বিশ্ববাসী। অনেকটা প্রিন্স চার্লসের অভিষেকের মতোই।

এই অন্ধ আধিপত্যবাদী আত্মরতি মূলক অনুষ্ঠানের দিনটি নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে সংঘ পরিবারের পক্ষে সম্মতি নির্মাণের জন্য বিতর্কিত ও হিন্দুত্ববাদী আদর্শের পূর্বপুরুষ সাভারকারের জন্মদিনটি চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। সংবিধানের পরিসরে শীর্ষতম ব্যক্তি এবং সংসদের রাজ্যসভার প্রধানের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনকি আমন্ত্রণও জানানো হয়নি। ক্ষমতাগর্বী প্রধানমন্ত্রী দেশের গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে পদদলিত করে স্পষ্ট একটি মাত্র বার্তা পাঠাচ্ছেন যে, আদিবাসী মহিলা বা যে কোনো জাতপাতের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র তাঁর। ভোটব্যাঙ্কের প্রয়োজনে তাঁদের নির্বাচিত করা হবে। আসলে তাঁরা ক্রীড়নক মাত্র।

আশার কথা এই চরম দুরভিসন্ধিমূলক আধিপত্যবাদী বেপরোয়া হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট নেতৃত্বের উদ্যোগে দেশভাগের অন্যতম কারিগর এবং গান্ধীজীর হত্যাকারীর প্রেরণাদাতা সাভারকার সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বর্জন করছেন অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। এমনকি প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বিজেপি'র সঙ্গে টানাপোড়েনে বাঁধা আপ এবং তৃণমূল কংগ্রেসও এই বৃহত্তর মঞ্চের শরিক। সম্প্রতি আপও বুঝেছে শীর্ষ আদালতের রায়ের অবমাননা করে প্রশাসনিক বদলি সংক্রান্ত অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, মার্কসবাদী দল ও ব্যক্তিরা জানেন যে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সহ প্রচলিত শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য চাই প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক সমর্থন। অবক্ষয়িত মূল্যবোধ চারিয়ে দিতে হয় সমগ্র সমাজে। এঙ্গেলস এই বোধকে বলেছেন ''ছদ্ম চেতনা''।

ইতালির ফ্যাসিবাদী সর্বাধিনায়ক মুসোলিনির কারাগারের বন্দীজীবনে দার্শনিক গ্রামশি মার্কসবাদকে কর্মকাণ্ড বা অনুশীলনের দর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জেলখানার ডায়েরীতে লিখেছেন যেকোনও শোষণূলক ব্যবস্থার, বিশেষ করে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার স্থায়িত্বের কারণ হিসেবে একাধারে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও অপরদিকে আধিপত্যবাদী ক্ষমতার সমর্থনে ব্যাপক সম্মতি নির্মাণ প্রয়োজন। গ্রামশি এর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের কাছে বিকল্প সংগ্রাম বা যুদ্ধের সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফ্যাসিস্ট শক্তি মদগর্বে অন্ধ হয়ে বুঝতে পারে না কখন তাদের পক্ষে অধিকাংশের সম্মতির মাটি পায়ের তলা থেকে সরতে শুরু করেছে। বামপন্থীদের এই সময়ে ক্রমশ বিষয় থেকে বিষয়ীতে উত্তীর্ণ হয়ে, সমাজের চলন বিশ্লেষণ করে বিকল্প আধিপত্যবাদী সম্মতি নির্মাণের অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। এভাবেই সমাজের সর্বস্তরে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব মহিলা সহ বৃহত্তর নাগরিক সমাজের উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে শত সহস্র গণক্ষেত্র নির্মাণ করে ফ্যাসিবাদী শাসকের আধিপত্যবাদী সম্মতির বালির পাহাড় ভেঙে দিয়ে, বিকল্প সম্মতি নির্মাণের অনুশীলন করতে হবে। এভাবেই বাস্তব সংগ্রামের ভিত্তি নির্মিত হবে।

ইদানীং আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে স্কুলে, কলেজে, কর্মক্ষেত্রে ও নাগরিক সমাজে ধীরে ধীরে এই সর্বগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী চরিত্র এবং তার আর্থরাজনৈতিক আগ্রাসী অভিমুখ সম্পর্কে ধীরে ধীরে একধরনের সাধারণ মানের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র এই সাধারণ সচেতনতা হয়ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত 'অপর' নির্মাণের কারণ বুঝলেও গ্রামসি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই ধরনের বিকল্প সম্মতি এবং আধিপত্যবাদ নির্মাণের কাজ পূর্ণতা পাবে না।

সেই কাজে এগিয়ে আসতে হবে দেশের বামশক্তিকে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, জলজঙ্গল জমি থেকে উৎখাত হওয়া জনজাতির সংগ্রামের অভিমুখকে অনুধাবন করতে হবে। এভাবেই বিকল্প ক্ষমতার গণক্ষেত্র সমূহ স্বাভাবিক গতিতেই বৃহত্তর বিকল্প শক্তিতে উন্নীত হবে।

মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন হলেও বামপন্থীদের সেই পথেই চলতে হবে

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বিশেষ সখ্য কোনও নতুন প্রসঙ্গ নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যিক সরকারের নগ্ন দালালের ভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে ভারত অতীতে ছিল না। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালেই বিজেপির মার্কিন ঘেঁষা বিদেশ নীতি প্রকাশ্যে এসেছিল। এখন তো মোদির বিদেশনীতি একেবারেই মার্কিন নির্দেশ অনুসারী। ট্রাম্প হলেও যা, বাইডেন আমলেও তা-ই। সংকটদীর্ণ পুঁজিবাদী বিশ্ব দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের কাছাকাছি সময়কাল উত্তরণের পথ সন্ধান করে চলেছে। এখনও গভীর অন্ধকারে হাতড়ে মরছে। এত দীর্ঘকালীন মন্দা বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভাবিত পূর্ব মারণযজ্ঞ সংগঠিত হবার পরেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট সম্ভাবনা থেকে পূর্ণ বিরতি হয়নি। এবারের সংকট আরও গভীর ব্যাপক এবং অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। জটিলতাও যেন অনেক প্রবল। প্রযুক্তির উন্নতি উৎপাদন ক্ষমতার বিশেষ বৃদ্ধি ঘটালেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পণ্য বাজার সংকুচিত হয়েই চলেছে। ক্রয়ক্ষমতা- সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না। ফলে বাজারের সংকট পণ্য উৎপাদক দেশগুলির কর্তাদের কপালে ভাঁজ ফেলেই চলেছে।

জনসংখ্যার বিচারে ভারত বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশ। এই দেশটি এখনও মূলত দরিদ্রপ্রধান। সরকারি দান-খয়রাত নির্ভর মানুষের সংখ্যা বিশাল। অশিক্ষা এবং সামাজিক নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস আমাদের প্রিয় দেশে। শিল্প উৎপাদনের শৃংখল আঞ্চলিক বৈষম্যযুক্ত। কোনো কোনো অংশে বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প বা কলকারখানা গড়ে উঠেছে বেশ শ্লথগতিতে। একদা যেভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় যে গতিতে শিল্পউদ্যোগগুলি উৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি নির্মাণ করছিল ইদানীং নরেন্দ্র মোদির সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতির কারণে সেসবের উলট পুরাণ চলছে। একে একে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। যে দ্রুততায় এগুলি গড়ে উঠেছিল সে তুলনায় অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে সেগুলির বিলয় ঘটে চলছে। কোনও ইতিবাচক পরামর্শ বা প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদির কর্ণপাত করার অভ্যাস নেই।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির নির্মাণ পর্বে একথা কেউ কেউ মনে করতেন যে, ভারত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছে। বাস্তব বিচারে সেই অবধারণাটি যথার্থ ছিল না। কিন্তু একটি বিষয় স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের মতো একটি বিপুল জনসংখ্যার দেশে ধারাবাহিকভাবে মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশের সরকারের প্রধানতম কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। সেইদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিশেষ জনকল্যাণকামী ভূমিকা ছিল। সেগুলি নিছক অতিমুনাফা অর্জন করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত ছিল না।

দেশের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে যে পরিকল্পনা হলে দেশের সর্বজনীন উন্নয়ন সম্ভব তা এদেশের শাসকরা আদৌ ভাবেন না। মানুষের প্রাথমিক স্বার্থ ধ্বংস করতেই এরা বেশি উৎসাহী। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বর্তমান শাসককূল নিঃসন্দেহে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে।

সর্বজনবিদিত যে, ভারতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনায় অনেক বেশি নবীন বয়সের মানুষের বাসস্থান। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশেরও বেশি যুবক যুবতী। এদের মধ্যে অনেকেই কম বেশি শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। এদের সকলের জন্য সসম্মান ও যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তাযুক্ত স্থায়ী জীবিকার সুচারু ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের প্রাথমিক নীতি হবার দাবি রাখে। মোদি সরকার এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ভারতে শিক্ষিত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত স্ফীত হয়ে চলেছে। সরকারের কোনো ভ্রূক্ষেপেই লক্ষ করা যাচ্ছে না। বরঞ্চ, বিশাল সংখ্যক যুবক যুবতীদের জীবিকার প্রশ্নটি পূর্ণতই অবহেলিত। অর্থাৎ, দেশের এক তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যার নাগরিকদের বেদনাহত অনিশ্চয়তার মধ্যে অক্লেশে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কেন্দ্র বা অধিকাংশ রাজ্যগুলির প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিরা নিতান্ত হাস্যকর বা বিয়োগান্তক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশের নাগরিকদের সঙ্গে চরম প্রবঞ্চনা করে চলেছে। বর্তমানে তথ্য পরিসংখ্যান নির্মিত হচ্ছে একান্তভাবে সত্য গোপন করার লক্ষ্যে। ভারতের কৃতবিদ্য পরিসংখ্যানবিদরা সরকারি সংস্থাগুলি থেকে সরে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ বা সমালোচনা সরকারের বধির কর্ণে প্রবেশই করছে না।

এদেশে অতীতের সরকারগুলি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে কমহীনতার গভীর সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করেছে, তেমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা অস্বীকার করেনি। অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত নেতানেত্রীরা বেকারত্বের অভিশাপে দীর্ণ যুবকযুবতীদের কাছে অনুশোচনাও করেছেন। নরেন্দ্র মোদি সরকারের কোনও দিন এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য পর্যন্ত নেই। ভালো মন্দ পরের কথা।

অতি উদ্ধত দুর্বিনীত এবং দেশের সাধারণ স্বার্থের কাছে এক প্রবল বিপদ মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রক ও দপ্তরগুলিতে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ দীর্ঘকাল যাবৎ পূরণ করার উদ্যোগ নেই। শুধু মাত্র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই সোচ্চারে আকাশবাতাস প্রকম্পিত করে। মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সে সব রক্ষা করার ন্যূনতম সততাও মোদি সরকারের নেই। পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক অঙ্গরাজ্যেও একই করুণ অবস্থা।

সরকারি ক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান না হলে পুঁজি ও প্রযুক্তিনিবিড় বেসরকারি ক্ষেত্রে বেকারত্বর অবসানে কোনও মাথাব্যথা থাকতে পারে না। বরং অতি মুনাফা অর্জনে উন্মাদ বেসরকারি কোম্পানিগুলি নিয়মিত কর্মচারী ছাঁটাই করেই চলে।

ভারতের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তপসিলী ও উপজাতিভুক্ত। এদের ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে রিজারভেশন ব্যবস্থা প্রচলিত। সংরক্ষণ যতটুকু থাকে তা, শুধুমাত্র সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে। নতুন নিয়োগ বন্ধ থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ যুবক যুবতীরা নিদারুণভাবে

—এরপর ৬ পাতায়

আদানি কাণ্ডের সত্য উদঘাটনের দায়িত্ব যৌথ সংসদীয় কমিটির হওয়া উচিৎ

সুপ্রিম কোর্টের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীকে ছাড়পত্র (clean chit) দেওয়া হয়েছে কী? সংবাদ মাধ্যমের একাংশের বিবৃতিতে এমনটাই মনে হতে পারে, এমন কি, এই সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম কিছুটা হলেও হতাশা প্রকাশ করেছে। বাস্তব ঘটনা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে প্রকৃত ঘটনা এমন নয়। বস্তুত সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্টে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে এমন কোনও মন্তব্য করা হয়নি যাতে মনে হতে পারে সুপ্রিম কোর্ট আদানি গোষ্ঠীকে যাবতীয় দুষ্কর্মের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র বলেছে সেবির (SEBI) তদন্ত কার্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় নিয়ন্ত্রক সংস্থার (Regulatory Failure) ব্যর্থতার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আদানি কাণ্ড সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। শুধু তাই নয়, আদানি কাণ্ড সম্পর্কে যাবতীয় ধোঁয়াশা মুক্ত করার জন্য SEBI-কে আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। আদানি গোষ্ঠীকে যাবতীয় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে কিনা, তার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সীমিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আদানিদের সম্পর্কের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটন সুপ্রিম কোর্টের পক্ষেও সম্ভব নয়। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে জয়রাম রমেশ এমন মন্তব্যই করেছেন। এ কারণেই বিরোধী পক্ষের দাবি, প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সেবির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ করেছে। আদানি গোষ্ঠী শেয়ার কেনাবেচার ব্যাপারে প্রচুর নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেছে। অন্তত ১২টি সন্দেহজনক শেয়ার লেনদেন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আদানি গোষ্ঠীকে যাবতীয় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া বা Clean Chit দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া, বিশেষজ্ঞ কমিটির আওতার বাইরেও আরও অসংখ্য প্রশ্নের সদুত্তর প্রয়োজন। বিশেষ কতকগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আদানি গোষ্ঠীকে একচেটিয়া ব্যবসায়িক সুযোগ দেওয়া হল, কোন পথে? কীভাবে বাংলাদেশে কেবলমাত্র কূটনৈতিক সৌজন্যের জন্য বিদ্যুৎ, বন্দর, শক্তির যাবতীয় সম্পদ আদানিদের হাতে সমর্পণ করা হল? জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং স্টেট ব্যাঙ্কের আদানি গোষ্ঠীতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল? ইত্যাদি আরও অসংখ্য প্রশ্ন আছে, শুধুমাত্র JPC বা যৌথ সংসদীয় কমিটিই সত্য উদঘাটন করতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের নরসিমা রাও ১৯৯২ সালে হর্ষদ মেহতা কেলেঙ্কারীর রহস্য উদঘাটনের জন্য JPC -র উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে, বিজেপির প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও কেতন পারেখ কেলেঙ্কারীর তদন্তের জন্য JPC গঠনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন।

তাহলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভয়ের জায়গাটা কোথায়? আদানি গোষ্ঠী কাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার অধিকার জনগণের আছে। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে JPC র উপরই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

গণতন্ত্রের আলখাল্লার আড়ালে ফ্যাসিবাদ কায়েমের প্রকল্প

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে বিশ্বের সর্বত্রই ফ্যাসিবাদী ভাবধারার অনুগত মানুষদের রাষ্ট্রের সবধরনের প্রতিষ্ঠানের অন্দরে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করে ফ্যাসিবাদীরা। এদেশেও হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষমতা দখল করার বেশকিছুকাল আগে থেকেই দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে, লক্ষণীয় যে, কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ রাষ্ট্রের নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয়। নানা উচ্চপদে সঙ্ঘ প্রভাবিত মানুষদের অবস্থান বিশেষ মনযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ স্বাধীন বিচারব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সমস্যা, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল সংবিধান অনুগত বিচারকদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান জমানায় নিয়োজিত বিচারপতিদের মধ্যে নয়জন বিচারপতিদের মধ্যে কর্মরত পাঁচজন বিচারক আছেন যাঁরা সংবিধান ছাপিয়ে তাঁদের রায় দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত অযোধ্যা মামলা। এমন ধর্মতান্ত্রিক বিচারকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এঁরা সংবিধানের পরিবর্তে সংবিধান বহির্ভূত নানা উৎস থেকে, ধর্মের মধ্যেও আইনের উৎস সন্ধানে আগ্রহী। নিজেদের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এবং বিবিধ ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত কারণবশত দেশের সংবিধানের প্রতি আস্থার পরিবর্তে বেদ বা সনাতন ধর্মের প্রতি বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। দেশের বিচার ব্যবস্থার দলীয় রাজনীতির কাছে ক্রমবর্ধমান আত্মসমর্পণ সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে এক অশনিসংকেত। ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশের বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিকৃত পথে দখল করতে চায়। সম্প্রতিকালেই নয়, বস্তুত নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই বিচারপতি নিয়োগের প্রসঙ্গ নিয়ে সংঘাত চলছে। আশার বিষয়, সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতির ইতিবাচক ভূমিকা।

ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে দু-চার কথা

এক বছর অতিক্রান্ত। ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে ইউক্রেনে। ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ছাপিয়ে একটা প্রশ্ন উঠে আসছে কেন এই যুদ্ধ, যা আপাতত দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে। ভ্লাদিমির পুতিনকে পররাজ্যলোভী উন্মাদ একনায়ক বলে তাঁর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধের কারণের এক সরল ব্যাখ্যা হতে পারে। আসলে মাথায় রাখতে হবে, যুদ্ধ এক আর্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যার প্রয়োজনে এই যুদ্ধ। কিন্তু কি সেই প্রয়োজন? এর উত্তরে, আমাদের বুঝতে হবে, এই যুদ্ধের অসংখ্য কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ বর্তমান বিশ্বে লিথিয়াম ও বিরল মৃত্তিকা ধাতুর (Rare Earth Metal) ভূমিকা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের স্তর পেরিয়ে এখন শুরু হয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। আজ বিশ্বে অনেক অনেক বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন যার যোগান খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা জীবাশ্ম জ্বালানির পক্ষে পূরণ করা অসম্ভব, ভবিষ্যতের জ্বালানিকে সস্তা হতে হবে, সহজলভ্য হতে, হাল্কা হতে হবে, এবং অবশ্যই Renewable Energy বা নবীকরণ যোগ্য হতে হবে। সর্বোপরি, কম জায়গায়, সুলভে সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন হবে লিথিয়াম, দস্তা, কোবাল্ট, নিকেলের দ্বারা নির্মিত ব্যাটারী এবং বর্তমানে শক্তিসঞ্চয়ের সবচেয়ে সস্তা, ছোট উপায় হল আধুনিকতম শিল্পে বর্তমানে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। গত এক দশকে লিথিয়ামের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে, আজ বিশ্বের ইউক্রেন সহ যে সব অঞ্চলগুলিতে বিরল ধাতু এবং লিথিয়ামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে, তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক LITHIUM RUSH, উত্তর আমেরিকার GOLD RUSH-এর মতোই শুরু হয়েছে বিশ্বের ক্ষমতাবান দেশগুলি—চিন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০২০ সালে ইউক্রেনের ভূতাত্ত্বিক জরিপে জানা গিয়েছে "Ukraine possesses one of the largest Lithium Deposits in Europe with proved resources, and contingent resources. There are two lithium fields and two explored prospective areas, as well as a number of promising accumulations." এই আবিষ্কারের মধ্যেই সম্ভবত পাওয়া যাবে ইউক্রেন যুদ্ধের অনেক টানাপোড়েন ও প্রশ্নের উত্তর। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালেই ইউক্রেন ইউরোপের লিথিয়াম সহ অন্যতম সর্ববৃহৎ খনিজ ভাণ্ডারের দেশ বলে ঘোষণা করেছে, যা বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নজর এড়ায়নি।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের অর্থনৈতিক নির্ধারকরা বলছেন, "...The pace and reach of technologicial developments will increase, transforming human experiences and capabilities, creating new tensions and disruptions for all actors. Global competition for core elements of technology will increase."

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বর্তমান আবহে বৃহৎ শক্তিগুলির তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাসের জোরে বিশ্ব জুড়ে দাদাগিরির যুগ শেষ হতে চলেছে। চিন বিকল্প শক্তি নিয়ে সুদূর প্রসারী অনুসন্ধান চালাচ্ছে, নানা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এমন কি অস্ট্রেলিয়ার এই দৌড়ে সামিল অস্ট্রেলিয়া যেমন বিশ্বের ৭০ শতাংশ লিথিয়াম নিষ্কাশন ও রপ্তানি করে, তেমনি চিনে রয়েছে বিশ্বের ৭০ শতাংশ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরির পরিকাঠামো, বর্তমান পর্যায়ে নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে রাশিয়াও ইউক্রেনের সবচেয়ে খনিজ সমৃদ্ধ দনবাস ও দনেস্তক রাজ্যগুলির উপর পুরোপুরি দখল নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব জুড়ে আধিপত্য প্রসারের দ্বন্দ্ব বাড়তেই চলেছে, এর অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই "Global Trend 2040 : A more contested world" এর মতে "The tension from fossil has the potential to significantly reshape geopolitics and economics, a shift to renewal energy will increase competition over certain minerals, particularly cobalt and lithium for batters, and rare earths for magnets in electric motors and generators এই রিপোর্টের মধ্যেই রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যতম এক বড় কারণ। তাই ইউক্রেন যুদ্ধ হয়ত চলতেই থাকবে, সীমিত লক্ষ্য পূরণের জন্য হলেও যুদ্ধ চালিয়ে গেলে বিবদমান সব পক্ষেরই ফয়দা হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে কেন নবনির্মিত সংসদ উদ্বোধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে

আগামী ২৮ মে নবরূপে সজ্জিত সংসদ ভবনের উদ্বোধন করতে চলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী—প্রচলিত রীতিনীতিগুলির বেড়া টপকিয়ে চলেছে আত্মোন্মাদ প্রধানমন্ত্রী। প্রচলিত প্রোটোকল অনুযায়ী এই কাজটি করার কথা দেশের রাষ্ট্রপতির। প্রশ্ন হল কেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে সংসদ ভবন উদ্বোধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। একোনও দয়া দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নয়, অধিকারের প্রশ্ন, সংসদীয় রীতিনীতির প্রশ্ন. এ প্রশ্ন শুধুমাত্র বিরোধী দল কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরোধী দলগুলিরই নয়, দেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরও প্রশ্ন বটে। গণতন্ত্রের শীর্ষস্থান বা মন্দির সংসদ ভবন, দেশের মানুষই এই সংসদ ভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাষ্ট্রপতি পদ সংসদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল নির্যাসকে এভাবে ধ্বংস করা যায় না। দেশবাসী প্রশ্ন করতেই পারে, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের অধিকার থেকে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনও বিশেষ বার্তা দিতে চাইছেন কী? প্রধানমন্ত্রীর এমন অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে শাসক দল তথা প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরাচারী মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মোদী জমানায় সবকটি গণতান্ত্রিক সংস্থাকে স্বশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন তো ঘোষণাই করেছে, প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান আইনের উর্দ্ধে। সংসদে সাংসদদের ভাষণ ইচ্ছে মত বাদ দেওয়া হচ্ছে, অতএব প্রেসিডেন্টকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা না দেওয়াটা কোনও অভিনব ঘটনা নয়। অধিকাংশ বিরোধী দল সংসদ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না। সারা ভারত আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রীর প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ এবং অসাংবিধানিক কাজের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

ভারতে রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠছে। নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির সবকিছুতেই জোরপূর্বক নিজের নাম খোদাই করতে অত্যুগ্র আচরণ করে চলেছেন। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের ক্ষেত্রেও সেই মানসিকতার উগ্র প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে।

কর্ণাটকের নির্বাচন—একটি সমীক্ষা

(এক)

২০২৩-এর দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটক বিধানসভার নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে ১০ মে। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ। ফলাফল জানা গেছে— ১৩ মে। সর্বমোট ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। ভোট দিয়েছেন ৭৩.১৯ শতাংশ। মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ। কর্ণাটকের নির্বাচনী ফলাফল অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টিকারী।

দক্ষিণের এই রাজ্যটির বিধানসভা অতীতে অর্থাৎ ১৯৭৮-এর আগে মহীশূর বিধানসভা হিসেবে পরিচিত ছিল। নানা পরিমাপে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যটি বেশ উন্নত। এই রাজ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের অভাব নেই। ওয়ারিয়াদের মহীশূর রাজপ্রাসাদ থেকে হাম্পির আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কর্ণাটকের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। সাংস্কৃতিক বিচারের কর্ণাটক বহু শতাব্দী ধরেই বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এই রাজ্যেই টিপু সুলতানের মতো এক ঐতিহাসিক চরিত্রের বিচরণভূমি। স্বাধীনচেতা রাজা হিসেবে তিনি ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসমসাহসী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর শৌর্যবীর্যের ইতিহাস রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লোকগাথায় পরিণত। দূরপাল্লার কামান ব্যবহার করে শত্রুসৈন্যদের বিপর্যস্ত করার প্রযুক্তিও তিনিই প্রথম ব্যবহার শুরু করেন বলে ইতিহাসে উল্লিখিত।

অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার বিরোধী যুক্তিবাদী আন্দোলন এই রাজ্যে বিশেষ বেগবান। কন্নড় ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. ইউ আর অনন্ত মূর্তির নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করে। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি আমৃত্যু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থেকেছেন। আবার উগ্র ধর্মান্ধতাবাদী সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের প্রসারও দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কন্নড় ভাষার প্রথিতযশা গবেষক, অধ্যাপক মালেশাপ্পা কালবুর্গি এবং অন্য অনেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কর্ণাটকের হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর দায়িত্বও কালবুর্গি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। উগ্র হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপো বাহিনী বৃদ্ধ অধ্যাপককে নৃশংসভাবে তাঁর বাড়িতে সশস্ত্র আক্রমণে হত্যা করেছিল। সমগ্র দেশের শুভবোধসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 'লঙ্কেশ পত্রিকে'র সম্পাদিকা গৌরী লঙ্কেশকেও ওই গেস্টাপো বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে প্রাণ হারাতে হয়। হত্যার ধরন লক্ষ করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, অধ্যাপক কালবুর্গি, গোবিন্দ পানসারে বা তারও আগে ডা. নরেন্দ্র দাভোলকার এবং গৌরী লঙ্কেশ একইভাবে বন্দুকবাজদের নিশানায় পরিণত হয়েছেন। একই ঘাতকবাহিনী এমন জঘন্য অপকর্ম করেছে।

আসামীদের গ্রেপ্তার ও যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতায় এখনও সম্ভব হয়নি। দেশের প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং যুক্তিবাদী মননের সমাজ ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম দিকপাল গিরিশ কারনাডও কর্ণাটকের মানুষ। এই সমস্ত প্রখ্যাত ব্যক্তিরা সারা দেশের উন্নত চিন্তার মানুষের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরিত। এমন আরও উদাহরণ সহযোগে অনুধাবন করা সম্ভব যে, কর্ণাটক রাজ্যটি অনেক অর্থেই বিশেষ।

কর্ণাটক বিধানসভার নির্বাচনে গর্বোদ্ধত উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি পর্যুদস্ত। ২০১৮'র নির্বাচন পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়কদের একাংশকে ঘোড়া কেনা বেচার মতো করে অনৈতিক পথে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল বিজেপি। ২০২৩-এর নির্বাচনী ফলাফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মতামত এমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, বিজেপি'র সামনে সেই অনৈতিকতার বিস্তারও আর সম্ভব নয়। কংগ্রেস এককভাবে ২২৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৬টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিজেপি'র সঙ্গে বিপুল ব্যবধান।

(দুই)

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে কর্ণাটক রাজ্যকে ৬টি রাজনৈতিক বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) কল্যাণ/গুলবার্গা/হায়দ্রাবাদ (৩১টি আসন) (২) কিট্টুর/বেলগাম/মুম্বাই (৫০টি আসন) (৩) কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক বিভাগ (৩৬টি আসন) (৪) মাইসুরু/দক্ষিণাংশ বিভাগ (৫০টি আসন) উপকূলবর্তী রাজনৈতিক বিভাগ (২১টি আসন) এবং বেঙ্গালুরু রাজনৈতিক বিভাগ (৩৬টি আসন)। সর্বমোট ২২৪টি আসন বিশিষ্ট বিধানসভা।

ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে বিজেপি'র শক্তিশালী বিভাগ কিট্টুর/বেলগাম অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেস বিজেপিকে ধরাশায়ী করেছে। বিজেপির জেতা আসন ৩৩ থেকে ১৭ হয়েছে। শতকরা হিসেবে বিজেপির ভোট ৪২.৬ শতাংশ থেকে ৩৯.৪ শতাংশে অবনমিত। কেন্দ্রীয় বিভাগে বিজেপি গতবারের জেতা ২৪টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬টি আসন ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। মাইসুরু বিভাগে দেবগৌড়ার জনতা দল (সেকুলার) শতাংশ হিসেবে ১৪.৯ শতাংশ থেকে মাত্র ৯ শতাংশে নেমে গেছে। বিজেপি বরঞ্চ এই অঞ্চলে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ হিসেবে কিছুটা ভাল অবস্থানে ১৮.২ শতাংশ থেকে ২১.৮ শতাংশে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

এই রাজ্যের দক্ষিণাংশে জনতা দল (সেকুলার) বেশ শক্তিশালী। জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক উপস্থিতিও এই অঞ্চলে ভালই। এবারের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। মোট ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনেই বিজেপি এবং জনতা দল পর্যুদস্ত হয়েছে। কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ৫.৮ শতাংশ। এই অঞ্চলে বেশ ভাল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করেই জেডি(এস) অতীতে কর্ণাটকের শাসন ক্ষমতা পরিচালনায় নির্ণায়কের ভূমিকায় ছিল। এমনকি দেবগৌড়ার পুত্র কুমারস্বামী কংগ্রেস সমর্থনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে রাজ্যের সাধারণ মানুষ জনতা দল (এস) কে আর কোনও সুযোগ দিতে চান নি। এই দলটিও বিজেপি'র মতোই বিপর্যস্ত হয়েছে।

গুলবার্গা হায়দ্রাবাদ অংশেও জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট ৪২.২ শতাংশ থেকে এবারে ৪৩.৩ শতাংশ হয়েছে।

উপকূলবর্তী কর্ণাটক অবশ্যই বিজেপি'র শক্তঘাঁটি হিসেবে এবারেও প্রতিপন্ন। এক বড় সংখ্যক আসন লাভ করেছে বিজেপি। তাহলেও এই অঞ্চলে বিজেপি'র আসন সংখ্যা গতবারের তুলনায় কম। ১৮টি থেকে ১৩টি আসন। জাতীয় কংগ্রেস ভোটের শতকরা হিসেবে গতবারের ৩৯.২ শতাংশ থেকে ৪১.৩ শতাংশ পেয়েছে। এটা অনেকটা অগ্রগতি বলেই ধরে নেওয়া যায়।

আর এস এস বা বিজেপির আই টি সেল কর্ণাটক নির্বাচনে বিজেপি'র এমন ভরাডুবিকে লঘু করে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। গোদী মিডিয়া বা মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমগুলিও ঠারে ঠারে প্রচার করছে যে, কর্ণাটক রাজ্যে পরপর দুবার কোনও দলই নির্বাচনে জয়লাভ করেনি। এটাই স্বাভাবিক এবং সেই হিসেবে ২০২৩-এর নির্বাচনে বিজেপি'র পরাজয় কোনও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। বস্তুত বিজেপি'র নেতৃত্ব উপলব্ধি করেছেন যে, হিমাচল প্রদেশের পর কর্ণাটকে বিপর্যস্ত হবার ফলে মোদি-শাহ'র জনসম্মোহনী ভূমিকার কোনরকম অস্তিত্ব আর থাকছে না। তাঁরা ২০২৪ এর সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিশেষ শঙ্কিত। ২০২৪-এর আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্য বিধানসভার ভোট। মোদি-শাহ বা নাড্ডা প্রমুখ রাতের ঘুম ভুলে গেছেন।

মনে রাখতে হবে যে, কর্ণাটকে কোনও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট গঠন করে জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করেনি। ওই রাজ্যে বামদলগুলির উপস্থিতি বা জনগণের মধ্যে প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রবল। ফলে জোটবদ্ধ হবার কোনও উদ্যোগ জাতীয় কংগ্রেসও নিতে পারেনি। তাঁদের প্রচারের সিংহভাগ ছিল ধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে মানুষে মানুষে সদ্ভাব গড়ে তোলার প্রসঙ্গই বেশি উঠেছে কংগ্রেস নেতাদের ভাষণে। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি অবশ্যই বিপুল অংশের রাজ্যবাসীকে প্রভাবিত করেছে।

কর্ণাটক বিধানসভার ভোটের বাদ্যি বেজে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বজরং দলের অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্য বেড়ে চলে। গবাদি পশুর কেনাবেচার বিরুদ্ধেও জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। ইদ্রিশ পাশা নামে এক মুসলিম ব্যক্তিকে গোহত্যার কল্পিত অভিযোগে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় কংগ্রেস এবারের ভোটে কোনও নরম হিন্দুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ রাহুল গান্ধিরা সরাসরি ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে কর্ণাটকে বজরং দলের মতো খুনে বাহিনীকে নিষিদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি পি এফ আই-এর মতো মুসলিম জঙ্গি সংগঠনকেও নিষিদ্ধ করা হবে।

কর্ণাটক নির্বাচনে বিজেপি পরিচালিত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির বিস্তার এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ কংগ্রেস দল বিশেষভাবে উস্‌কে দিতে পেরেছে। মোদির দল হয়তো ধরেই নিয়েছিল যে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও হানাহানির প্রসঙ্গ সোচ্চারে ব্যবহার করেই মানুষের মনোভাব পাল্টে দেওয়া সম্ভব। নরেন্দ্র মোদির বহুল প্রচারিত ''না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলি যে নেহাতই জুমলা তা, মানুষ সম্যক বুঝতে পেরেছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রবল অপচেষ্টা সাফল্য পায় নি। 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তা এখন অসার হয়ে পড়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের মণিপুরের পরিস্থিতি মানুষ দেখতেই পাচ্ছেন। মোদি-শাহ'র এসব প্রচার স্বভাবতই মানুষ গ্রহণ করেননি। কংগ্রেসের ভোট কাটার জন্য 'আপ' দলের কারসাজিও ব্যর্থ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা তাঁর স্যাঙাৎ অমিত শাহ প্রমুখের মনে হয়েছিল যে, কংগ্রেসের হিন্দু ভাবাবেগ বিরোধী এ ধরনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এই সুযোগে বিজেপি বেশ জমিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত প্রচার করতে পারবে। সংবিধানগতভাবে কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যে এমন নির্লজ্জভাবে 'জয় বজরংবলী' চিৎকারে নির্বাচনী প্রচার সভাগুলিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে বর্বরতাপূর্ণ ব্যবহার করবে তা ঠিক বুঝে ওঠা যায় নি। মোদি-শাহ-নাড্ডা চক্র এবং তাঁদের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের ফেক্ এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ যোগী আদিত্যনাথ কিংবা অসম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সহ প্রায় এক ডজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদ্দাম হয়ে উঠেছিলেন সংঘ পরিবারের লক্ষ্য হাসিল করতে। বাস্তব বিচারে মোদিদের আস্তিনে যত বিষাক্ত আয়ুধ ছিল সবই অক্লেশে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং কর্ণাটকের সাধারণ মানুষ স্থির প্রজ্ঞা নিয়ে বিজেপিকে বিপুল ব্যবধানে পরাস্ত করে ভারতের অন্যান্য অংশের সুস্থ সামাজিক বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে সমীহ আদায় করে নিয়েছেন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মোদি এবং তাঁর দলবল আর কত বেশি সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবেন? সবটাইতো কর্ণাটকে ব্যবহৃত ও বাতিল হয়ে গেল! এখন কি পাকিস্তান বা চিনের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধোন্মাদনা নির্মাণের অপচেষ্টা হবে? তা-ও বিজেপির মতো এক প্রকৃত দেশদ্রোহী শক্তির কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসারই সম্ভাবনা প্রবল।

নির্মোহ বিচারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনও শোষিত মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল নয়। এই দলটির দায়বদ্ধতা শ্রমজীবী মানুষের কাছে প্রধান নয়। কিন্তু কর্ণাটক নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত দায়বদ্ধভাবে রাজ্যের শ্রমকারী মানুষের গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দাবিগুলির পক্ষেই প্রচার করেছেন। রাহুল গান্ধি কিংবা তাঁর বোন নির্দিষ্টভাবে যেমন টিপু সুলতানের অশেষ দেশপ্রেমের কথা বলেছেন তেমনই, দেশের বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বিলুপ্তি বা নারী সমাজের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। দেশের বামপন্থী দলগুলির মতো করেই নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রচারে সামিল হয়েছে কংগ্রেস দল, এর গুরুত্ব সঠিকভাব অনুধাবন করা জরুরি।

ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতি থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে শ্রমিক কৃষক যুব-ছাত্র ও গরীব ঘরের মহিলাদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। দেশের বহুলাংশ মানুষের কাছে জাতীয় কংগ্রেসের বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতাকে সচেতনভাবে জনকল্যাণে ব্যবহারের প্রয়াস গ্রহণ করতেই হবে। **তথ্যসূত্র** : The Wire

রাণাঘাটে মহিলা সঙ্ঘের সভা

কালিয়াগঞ্জ, কালিয়াচক সহ সারা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ও চরম প্রশাসনিক অপদার্থতার প্রতিবাদে ২২ মে রানাঘাট চৌরঙ্গী মোড়ে আরএসপি প্রভাবিত নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন যে, সারা রাজ্যে দুর্নীতি এক প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। অপরদিকে সারা রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ক্রমবর্ধমান সরকার নীরব। নেতৃবৃন্দ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের চরম ব্যর্থতার নিন্দা করে রাজনৈতিক রং না দেখে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন কম. ভবানী বর্মন, কম. করবী সেন, কম. অঞ্জনা বিশ্বাস প্রমুখ।

কলকাতায় মার্কসের জন্মদিবসে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্পর্কিত আলোচনা

গত ৫ মে কার্ল মার্কসের ২০৫তম জন্মদিনে আরএসপি কলকাতা জেলা আয়োজিত কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের যুগান্তকারী গ্রন্থ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে একটি আলোচনা সভায় আরএসপি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, কার্ল মার্কস এবং তাঁর অভিন্নপ্রাণ বন্ধু ও সহযোদ্ধা এঙ্গেলস রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই যুগান্তর এনেছেন। কার্ল মার্কস তাঁর সমগ্র জীবনের মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে ইউনিভারসিটি অফ জেনা থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এবং এপিকিউরীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর এই থিসিস (পি এইচ ডি'র বিষয়) ৫টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। সর্বত্রই উচ্চ প্রশংসিত। তারপর তিনি ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সঙ্গে (যদিও তিনি প্রাচ্য দেশের মানুষ) আমাদের গৌতম বুদ্ধের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। আজ ঘটনাচক্রে তাঁরও জন্মোৎসব। দুজনেই মানুষের মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন। মার্কসের বহুপূর্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করলেও মানবজাতির কল্যাণের কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন এঁরা দুজনেই মানবতাবাদী—দার্শনিক।

সাধারণ সম্পাদক বলেন, মার্কসের জন্মদিনে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনার যে উদ্যোগ কলকাতা জেলা পার্টি নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁদের এই উদ্যোগ ধন্যবাদার্হ।

তিনি বলেন, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচিত হয়েছিল আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে। এই আলোচনার সূত্রপাতে বলেন যে, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো আলোচনার শুরুতে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার, তা হল ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের ইতিহাস দুনিয়া জুড়ে বৈপ্লবিক স্বপ্নের দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল। কিন্তু এরপর প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর কাছে ৭২ দিনের মধ্যে প্যারী কমিউন পরাভূত হয়। এই প্যারী কমিউন থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মার্কস বস্তুত সেইসময়ের ঘটনাবলীর প্রায় দিনলিপি ধরে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানবসমাজের আজ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। পরবর্তীকালে লেনিনও বলেন, রাজনীতিতে লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের সচেতন হস্তক্ষেপই বিপ্লব।

কার্ল মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি The Philosophers have only interpreted the world, in various ways, the point is however, how to change it. এটাই মার্কসের দর্শনের মূল কথা। মার্কস এঙ্গেলস এক্ষেত্রে বারবার উল্লেখ করেছেন educates the educators-এর কথা। তিনি এক্ষেত্রে আরো বলেন যে একাজের দায়িত্ব কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্বের। এক্ষেত্রে অবশ্যই কর্মীবাহিনীকে রাজনৈতিক চেতনায় অনুশীলিত, শিক্ষিত এবং উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা—শুধু অর্থনৈতিক বোধ থাকলেই হবে না, সমাজ পরিবর্তনের বোধও তার ভেতর অনুপ্রবিষ্ট করতে হবে। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সেই চেতনার অভাব থাকে। তাদের সচেতন কথাই বিপ্লবী দলের কর্মীবাহিনীর কাজ। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রতিটি শব্দই অর্থবহ। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো জার্মান ভাষায় ছাপা হয়। এরপর ১৮৫০ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ Red Republic থেকে প্রকাশিত হবার পর সারা পৃথিবীতে এই গ্রন্থের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। হেলেন ম্যাকফারলেন এই অনুবাদ করেছিলেন। আমাদের দেশে ১০টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। পৃথিবীর বহুদেশে, বলা যায় ১০০টি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখতে হল কেন?

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এটি একটি আকর গ্রন্থ। আমাদের দলের ক্যাডারবাহিনীকে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বুঝতে হবে। কারণ কর্মীবাহিনী নীতি আদর্শ না বুঝতে পারলে দলের অগ্রগমন সম্ভব নয়। আমাদের দল আন্তর্জাতিক ভাবধারায় বিশিষ্ট একটি কমিউনিস্ট পার্টি। আর আমাদের মনে রাখতে হবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো শুধু তত্ত্ব বা শুধু প্রায়োগিক বিষয় নয়। এটি তত্ত্ব ও অনুশীলনের মেলবন্ধন। এই মেলবন্ধনই মার্কসবাদের মূল কথা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মূল বার্তা, বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিদিন যেসব ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৭৪০-১৮৪০ এই ১০০ বছর শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) দীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত হয়। এই ইতিহাস মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে বিভিন্ন ভৌগোলিক আবিষ্কারের (উত্তমাশা অন্তরীপ, আমেরিকা প্রভৃতি) ফলে পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে যায়। এর ফলে বিভিন্ন দেশসমূহ কাছাকাছি এসে গেল। শুধু বাণিজ্যিক সুবিধা তৈরি হল তা নয়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতও বাড়ল। বাঁচার জন্য মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে আসতে শুরু করল এবং ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে আমরা চে গুয়েভারার মত বিপ্লবীর নাম করতে পারি। চে জন্মেছিলেন আর্জেন্টিনায়। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস আয়ারল্যান্ডে। প্রসঙ্গত কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হন, এরপর যান বলিভিয়া, পেরু, কলম্বিয়া ইত্যাদি জায়গায় চাঞ্চল্যকর অভিযানে অংশ নেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই ইশতেহার হঠাৎ করে লেখা হয়নি। তখনকার দিনে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে ও বুর্জোয়াদের আক্রমণকে প্রতিহত করার পথ স্থির করতেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো দরকার বলে স্বীকৃত হয়। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিশা প্রস্তাবিত হয়েছে তার কোনো পূর্ব ইতিহাস নেই। একথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব যেমন এঁদের মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনই এঁরা গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার সীমাবদ্ধতাও উপলব্ধি করেছিলেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো শুরুতেই মার্কস-এঙ্গেলস ইউরোপ কমিউনিজমের ভূত দেখছে বলে শুরু করেছিলেন।

'ইশতেহারের দুই তরুণ রচয়িতা (মাত্র ২৮/৩০ বছর বয়স) দারিদ্র্য, দেশে দেশে পুলিশের তাড়া ইত্যাদিকে মোকাবিলা করে ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করলেন। এঙ্গেলসের সাহায্যে মার্কস একাজ করতে পেরেছিলেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো আজও প্রাসঙ্গিক। বুর্জোয়া শ্রেণি কমিউনিজমের ভূত দেখেছে, তারা কমিউনিজমের ভয়ে ভীত ছিল। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বিজ্ঞানভিত্তিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই সময় যেমন একদিকে বাষ্প বিদ্যুৎ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে তেমনিই উৎপাদন ব্যবস্থাও পাল্টাচ্ছে। মানুষ প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করে মোকাবিলা করে তাকে পাল্টে নিচ্ছে। এখানেই চলার পথ নির্ণয় করছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

১৮৪৮-এ এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনার পূর্বে মার্কস এঙ্গেলসকে ইউরোপের এক দেশ থেকে অপর দেশে আত্মগোপন করতে হয়েছে। জার্মান সরকারের চাপে ফরাসী সরকারও কার্ল মার্কসকে প্যারিস শহর ছাড়তে বাধ্য করে। এরপর প্যারিস ছেড়ে বেলজিয়াম। বেলজিয়াম থেকে আবার নির্বাসন। আবার প্যারিস এবং শেষ পর্যন্ত লন্ডনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

১৮৪৭ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট লীগের প্রথম সম্মেলন এবং দ্বিতীয় সম্মেলন নভেম্বরে সংগঠিত হয়। সেখানেই—মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর লিগের কর্মসূচির খসড়া রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর তারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা শুরু করেন ও ১৮৪৮ -এর ফেব্রুয়ারি মাসে তা প্রকাশিত হয়।

১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কমিউনিস্ট লীগ যেমন তাদের অভীষ্ট কাজ করলেন শ্রমজীবী শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং শোষণমুক্তির ও সমাজ বদলের হাতিয়ার 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' তেমনি রচিত হয়, সেই সময়টা দর্শন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক দিয়ে ছিল বিশেষ অগ্রবর্তী। এর পূর্বেই age of enlightenment ইউরোপে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যুক্তিবাদের চর্চা এবং জীবনদর্শন বহু মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করেছিল।

মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ হল দ্বান্দিক বস্তুবাদী দর্শন। কুসংস্কার কাটিয়ে বস্তুনির্ভর এই দর্শন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান। যদিও ভারতবর্ষে তার আগেই চার্বাক দর্শনের মত নিরীশ্বরবাদী দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। এই বস্তুবাদই মার্কসবাদের মূল কথা। কর্মীদের জীবন, আচরণের মধ্যে এই বস্তুবাদের প্রভাব থাকা জরুরি, এর চূড়ান্ত অভাব ভারতের জনসমষ্টিকে এখনও আবিষ্ট করে রেখেছে। ব্রুনো বাওয়ার সঙ্গে মার্কসের অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। মার্কসের জীবনে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যদিও পরবর্তীকালে আদর্শগত বিষয় নয়, প্রায়োগিক কিছু বিষয় নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে মতপার্থক্য হয়, যা মূলত শিক্ষায়তনিক। ব্রুনো বাওয়ার অধ্যাপক পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ায় মার্কসের পক্ষে অন্যকিছু ভাবনার অবকাশ পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। তিনি অধ্যাপকের পেশা থেকে বাস্তরে সরেই যান।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে স্বল্পসময়ের কোনও আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এই পুস্তিকাটি আকারে অনেক বড় নয়। মাত্র ৩২-৩৩ পৃষ্ঠার। দলের সমস্ত কমরেডদেরই এই পুস্তিকাটি মনযোগ সহকারে বার বার পাঠ করা উচিত। তার পরেই এ ধরনের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। আমাদের দলের সর্বস্তরে এসব বিষয় আলোচিত হওয়া এবং মূল সুর আত্মস্থ করে বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঝাড়খন্ডে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের কনভেনশন

আজ সারা দেশে হিন্দুত্ববাদী কর্পোরেট জোটের মিলিত ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে জনজীবন বিপন্ন। এদের আক্রমণে ভারতের বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সংবিধান স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপের ফলে ভূলুণ্ঠিত। সাম্প্রদায়িক সহ বিভিন্ন ধরনের মেরুকরণের চক্রান্তের ফলে সামাজিক বিভেদ জনিত সংঘর্ষ বৃদ্ধি করে খেটেখাওয়া মানুষের জীবন জীবিতার সমস্যা জটিলতার জালে বন্দি। ঝাড়খন্ডে বিজেপি বিরোধীদলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্র আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংঘাতের চক্রান্ত করে চলেছে। কিন্তু বামপন্থীদের দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাজ্য সরকার আর এস এস-এর এই অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া রাজনৈতিক পরিসরে অন্যান্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো শক্তিশালী গণ আন্দোলনের পথে পদক্ষেপ করছে না। এই মুহূর্তেই এরাজ্যের নাগরিক সমাজ ও শ্রমিক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র বাম গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রস্তুতিতে এগিয়ে না গেলে এই ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে তাই এই মুহূর্তে এ রাজ্যের প্রতিটি বামপন্থী দল শ্রমিক কৃষক মহিলা ছাত্র যুবকদের আহ্বান করছে জমি থেকে উচ্ছেদ, বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হওয়া, বনাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা ইত্যাদির প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে।

এই সব শ্রেণিভিত্তিক দাবিদাওয়া সহ বিজেপি আর এস এস-এর কর্পোরেট স্বার্থনির্ভর সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে গত ১৯ মে ২০২৩ রাঁচীর পুরানো বিধানসভার সভাগৃহে রাজ্যের অধিকাংশ বামপন্থী দলের অর্থাৎ সি পি আই এম, আর এস পি, সি পি আই এম এল লিবারেশন, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি আই সি'র ডাকে একটি কনভেনশনে সংগঠিত করা হয়। পরিপূর্ণ সভাগৃহ ছাড়াও বহু মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনেছেন। এই সভায় কম. কে ডি সিং এবং কম. ভুবনেশ্বর মেহতা, সি পি আই এম-এর কম. সমীর দাস এবং কম. জি এন বক্সী, সি পি আই এম এল লিবারেশনের কম. বিনোদ সিং এবং আরএসপি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কম. গণেশ দিওয়ান ভার্মা এবং কম. পরভেজ আইয়ুবি। কম. মনোজ ভট্টাচার্য প্রধানত কিভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে পদক্ষেপ করছে বিজেপি আর এস এস, সংক্ষিপ্ত ভাষণে তা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটাই ভেঙে ফেলছে না, সেদেশের সম্পদ জল জমি জঙ্গল দেশি বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে। মিথ্যা আশ্বাস, চমক আর ভন্ডামি দিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের খেটেখাওয়া মানুষের কাছে এদের অপকর্ম ও আগ্রাসী শোষকের চরিত্র তুলে ধরে তীব্র গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রামের প্রস্তুতি ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে এই অপশক্তির শেকড় উপরে ফেলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। বামপন্থীদের অক্ষ করে বৃহত্তর বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকেই এই লড়াইয়ের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে।

নৈরাজ্যের বাংলায় তৃণমূলের হাত ধরে বাড়ছে বিজেপি

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজবজ, মালদার ইংরেজবাজার। রাজ্যে একের পর এক জায়গায় ঘটে চলেছে বিস্ফোরণ। আর তাকে কেন্দ্র করে মানুষের মৃত্যু মিছিল। এগরার খাদিকুল গ্রামে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে গত ১৬ মে। তার পাঁচ দিন পরেই বজবজের ঘটনা। তার দুই দিন পরে ইংরেজবাজার। এগরার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এগারো জনের মৃত্যুর কথা সরকার স্বীকার করেছে। বজবজে মারা গেছেন তিন জন এবং ইংরেজবাজারে দুই জন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজিতে বিস্ফোরণের কথা বলা হলেও, বোমা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তৃণমূলের রাজত্বে বোমা বানানো যেখানে কুটির শিল্প, সেখানে বাজি বানানোর নামে বোমা বানানো অসম্ভব নয়। এগরার ঘটনার পরেই অভিযুক্ত ব্যক্তির নানা কুকীর্তির অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে। এর আগেও এমন এই কারখানায় দুইবার বিস্ফোরণ ঘটেছে। মানুষও মারা গেছেন। বারে বারে দুর্ঘটনার পরেও এমনভাবে কারখানা চলে কীভাবে? জানা যাচ্ছে, বাজি দোকানের লাইসেন্স নিয়ে নাকি বাজি তৈরির কারবার চলত। পঞ্চায়েত লাইসেন্স দেয় কেন এবং সেখানে দোকানের লাইসেন্স নিয়ে কেমন করে কারখানা চলে তা প্রশাসনের অজানা নয়।

দোকানের লাইসেন্স নিয়ে যদি, কারখানা চলে, তবে বাজির লাইসেন্সে বোমা তৈরিও অস্বাভাবিক নয়। এই সম্পর্কে প্রশাসন ও শাসক দলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর তীব্র ক্ষোভের কথা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। পুলিশকে ঘিরে মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। শাসক দলের বড় নেতারা ঘটনাস্থলে গেলে, প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কতজন মারা গেলেন তার হিসেব সম্ভবত কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের চিত্র দেখে রাজ্যবাসীকে শিউড়ে উঠতে হচ্ছে।

বজবজের ঘটনাতেও প্রশাসনের অপদার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে নাকি অনুমতি ছাড়াই বেআইনি বাজি মজুত করা ছিল। ছিল নিষিদ্ধ বাজি। ইংরেজবাজারের ঘটনা ঘটেছে, থানার খুব কাছে। সেখানেও উপযুক্ত নিরাপত্তা ছাড়াই বাজি মজুত করা হয়েছিল। যদিও এই দুটি ক্ষেত্রেও বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্যের হাল হকিকত সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকলেই বোঝা যায়, শাসক দলের মদত ছাড়া এসব হতে পারে না। সবই চলে তাদের অনুপ্রেরণায়, কাটমানির বিনিময়ে।

নৈরাজ্যের ভয়ঙ্কর পরিণাম কিছুদিন আগেই উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। বালিকার মৃতদেহের প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান জানিয়ে পুলিশ নিজেদের অমানবিক প্রমাণ করেছিল। সেই ঘটনায় পুলিশের ওপর মানুষ কতটা ক্ষুব্ধ তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপরেই মালদা জেলায় আবার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। সরকার এরপরেও পুলিশ প্রশাসনকে ঠিক করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। বরং সবকিছুকে লঘু করতে গিয়ে অপরাধীদেরই উৎসাহিত করে চলেছে। রাজ্যে ঘটে চলেছে একের পর এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। সরকারের দায়িত্ব কেবল ক্ষতিপূরণ দেওয়া। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া নয়। রাজ্যবাসী অসহায়। প্রশাসন নির্বিকার। প্রত্যক্ষে অপরাধীদের মদতদাতা। সিন্ডিকেটরাজ ও নৈরাজ্যের আঁচ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপরেও গিয়ে পড়েছে। এম্বুল্যান্সের অস্বাভাবিক ভাড়া না দিতে পেরে ব্যাগে করে শিশু সন্তানের দেহ নিয়ে ফিরছেন বাবা। এম্বুল্যান্স চালকের আক্রমণে মারা যাচ্ছেন রুগী।

শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থেকে অসীম দেবশর্মা এমনভাবেই পাঁচ মাসের সন্তানের দেহ নিয়ে এলেন। অভিযোগ এম্বুল্যান্স চালক নাকি শিলিগুড়ি থেকে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে আসার জন্য আট হাজার টাকা ভাড়া চেয়েছিলেন। যমজ সন্তানের একজন সদ্যমৃত, আরেকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায়। তারই মধ্যে এভাবে মরদেহ আনা বাবার কাছে কতটা মর্মান্তিক সংবেদনশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে কালিয়াগঞ্জ থেকে সুদূর শিলিগুড়িতে শিশুকে নিয়ে যেতে হল কেন?

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাকে অন্যত্র রেফার করা হয়েছিল। বাবা ভরসা না করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে সন্তানকে নিয়ে যান। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানোর পরেও রেফারের রোক থেকে মেডিক্যাল কলেজগুলিও মুক্ত নয়। আর নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলির প্রতি মানুষ বিপদের মুহূর্তে আস্থাও রাখতে পারেন না। মাসখানেক আগেই জলপাইগুড়ি হাসপাতাল থেকে মহিলার মৃতদেহ কাঁধে করে বাড়িতে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর স্বামী ও পুত্র। চরম দারিদ্রের লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত।

মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এম্বুল্যান্সকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেটরাজ আরও প্রকট হয়। সালার গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে বিয়াল্লিশ বছরের চাঁদতারা বিবিকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। পরিবারের লোকেরা চেনা পরিচিত এম্বুল্যান্স চালককে ডাকলে হাসপাতালের এম্বুল্যান্স চালকরা রোগীকে নিয়ে যেতে বাধা দেন। এম্বুল্যান্স যাওয়ার রাস্তা আটকে দেন। বাড়ির লোকের অভিযোগ যে, একজন চালক রোগীর অক্সিজেন মাস্ক খুলে দিলে তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রামীণ হাসপাতালে বচসার সময়ে পুলিশকে বললেও নাকি কাজ হয়নি।

এত ঘটনার পরেও মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার নির্বিকার। অপরকে দোষ দিতেই ব্যস্ত। চলছে বাংলার যুবরাজের আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা। বিলাসবহুল বাসে চড়ে কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সফর সেরে তিনি এখন দক্ষিণবঙ্গ ঘুরছেন। সেই উত্তরবঙ্গে গাড়িভাড়া না দিতে পেরে পিতা, পুত্র সন্তানের দেহ ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরতে বাধ্য হন। বেআব্রু হচ্ছে 'এগিয়ে বাংলা'র আসল রূপ। তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ, বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা—এককথায় নৈরাজ্যময় রাজ্যের আসল চেহারা। অরাজকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবনমিত বাংলা।

রাজ্য সরকার তথা শাসক দলের থেকে অবশ্য সংবেদনশীলতা আশা করা চূড়ান্ত মূর্খামি। রাজ্যে এখন মৃত্যু, ধর্ষণ, সবকিছুই ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। করে কম্মে খেতে হলে দিতে হয় উচ্চমূল্যের নজরানা। টোটো স্ট্যান্ড থেকে হাসপাতালের সামনে এম্বুল্যান্স সবেতেই তোলাবাজি। চালক তার তোলাবাজিতে দেওয়া অর্থ উশুল করবেন যাত্রীদের থেকে। এম্বুল্যান্স, বেসরকারি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা হাসপাতালের আঁতাত সকলের জানা। এসব নতুনও নয়। কিন্তু এখন ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ নেই। মৃতদেহ, সদ্য সন্তানহারা পিতার আকুতি কোনোকিছুই সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির দলবলকে স্পর্শ করে না।

দুর্নীতি, তোলাবাজি, দুর্বৃত্তায়নের শিকড় কতটা গভীরে গেলে এমন পৈশাচিক ঘটনা ঘটতে পারে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। একজন অর্থলোলুপ অমানুষ এম্বুল্যান্স চালক কেবল হত্যাকারী নয়। হাসপাতাল তথা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গড়ে ওঠা চক্রের সঙ্গে জড়িত সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত। শাসক দল, পুলিশ, হাসপাতাল প্রশাসনের একাংশকে নিয়ে রাজ্যজুড়ে গড়ে উঠেছে এই চক্র। চলে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনতেন। ভাগ তৃণমূল স্তর থেকে ওপর তলায় কতদূর পর্যন্ত যায় তা সরকারের অজানা নয়। দলদাস পুলিশ রাজ্যজুড়ে অমানবিক হওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত।

শাসক দলের অনুপ্রেরণাতেই আজ রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থা। নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ হোমড়া চোমড়ার অনেকেই দুর্নীতির অভিযোগে জেলে। কেউ বা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকার থেকে নানা অছিলায় বন্ধ রাখতেই সরকার উৎসাহী। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তমূলক কাজে দক্ষতাই শাসক দলের নেতাদের যোগ্যতার মাপকাঠি।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাঁচতে রাজ্যবাসীকে একে অপরের বিরুদ্ধে খেপাতে চাইছেন। ডি এ নিয়ে আন্দোলন ভাঙ্গতে এতদিন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছিলেন। সদ্য চাকরিহারা বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মরত শিক্ষক, সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে খেপাচ্ছেন। বলছেন যে, ডি এ আন্দোলনকারীদের জন্যই নাকি তাঁদের চাকরি গেছে। এভাবেই নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি তিনি ধামাচাপা দিতে চান। একবারও বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীদের আন্দোলনের কথা বলছেন না। সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, অনিয়মে বা ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি। নাহলে ঘোর বিপদ। তোলা দিয়েও চাকরি খোয়ানো ব্যক্তিরা মুখ খুললে তৃণমূলের সর্বনাশ। এভাবেই চিট ফান্ডে সর্বস্ব খোয়ানো মানুষের রোষ থেকে তিনি বেঁচেছিলেন। রাজ্যে এখন দুর্নীতি করা অপরাধ নয়, তার বিরুদ্ধে বিচার চাওয়াই অপরাধ।

মুখ্যমন্ত্রীই যখন এমন গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান, তখন প্রশাসন ও শাসকদল বেলাগাম, বেপরোয়া হয়ে যায়। তিনি যখন চোর বললেও, 'বুক চিতিয়ে ঘোরার' নিদান দেন, তখন প্রকারান্তরে দুর্নীতিবাজ, দুষ্কৃতীদেরই স্বীকৃতি দেন। এমন অবস্থায় কেউ কাউকে মানবে কেন? নৈরাজ্যই তাই রাজ্যের ভবিতব্য। যুবরাজের রাজ্য সফর ঘিরেই তাই একই অবস্থা। শাসক দলের প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটাভুটিতেও ব্যালট ছিনতাই, মারামারি হচ্ছে। নেতারা দেখে নিচ্ছেন, মারামারি, ব্যালট ছিনতাইতে কে কত দক্ষ। সেই দক্ষতাই প্রার্থী হওয়ার আসল মাপকাঠি। শাসক দলের নানা স্তরের নেতা ও তাদের রকমারি বাড়ি, প্রাসাদ পাহাড়া দিতেই পুলিশ ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেবে কখন?

সেই সুযোগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। সি বি আই, ই ডি'র কাজ বাড়ছে। মোদির শাসনে কার্যত কেন্দ্রের বশংবদ এই সংস্থাগুলির সক্রিয়তা ভবিষ্যতের জন্য ভালো নয়। এবারেও তাদের ভূমিকা সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। তদন্তের শ্লথ গতি নিয়ে খোদ বিচারকরা ই ডি বা সি বি আই'র বিরুদ্ধে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চিট ফান্ডে অপরাধীদের শাস্তি এখনও অধরা। এন আই এ নিয়ে বিজেপি বিরোধী রাজ্য সরকারগুলির ক্ষোভ আছে। অথচ, এগরা কান্ডে এন আই এ তদন্তকে এই রাজ্যের সরকার স্বাগত জানাতে বাধ্য হল।

কোন শক্তির হাত শক্ত করছে তৃণমূল? তৃণমূলের অপশাসনের সুযোগ নিয়ে কারা রাজ্যে ভিত শক্ত করার সুযোগ পাচ্ছে? একদিকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের অতিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁকের বিরুদ্ধে বলে বাজার গরম করবেন। অপরদিকে ঘুরপথে রাজ্যে সেই সুযোগ করে দেবেন। কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করতে এগোবেন। চুপিসাড়ে এন আর সি'র প্রথম ধাপের কাজ করে দেবেন। ধর্ম, জনজাতিভিত্তিক পরিচয় সত্তার রাজনীতিকে লালন করে বিজেপি তথা আর এস এসের সুযোগ করে দেবেন। মূল স্রোতের সংবাদমাধ্যমে তৃণমূল-বিজেপি'র তরজা দেখিয়ে এসব আড়াল করতে চাইছে।

বাম, প্রগতিশীল আন্দোলনের দীর্ঘকালের শক্ত জমিতে তৃণমূলের হাত ধরে ফসল তুলতে চাইছে মৌলবাদী শক্তি। ভোটের রাজনীতিতে দুই দলের মধ্যে লড়াইটাকে আটকে রাখতে হবে। আর তলে তলে মৌলবাদী শক্তিকে সুযোগ দিতে হবে। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংসের আর এস এস এজেন্ডাকে রাজ্যে বাস্তবায়িত করার সুযোগ দিতে হবে। এটাই তৃণমূলের হিডেন এজেন্ডা। খাদের কিনারে রাজ্য। বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র গণ প্রতিরোধই পারে রাজ্যকে বাঁচাতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ২৬৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (AUKUS) -এর মধ্যে ২৬৫ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন পাবে।

এই অতর্কিত ঘটনায় সংবাদ মাধ্যম ও সারা বিশ্বে তুমুল শোরগোল শুরু হয়েছে। চুক্তি অন্তর্গত দেশগুলির অভ্যন্তরে তুমুল আলোচনা ও বিতর্ক চলছে, এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে চীন সতর্ক বাণী দিয়েছে। চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মারাত্মক বিপদ ও ভুল পথে চলছে, পারমাণবিক সম্প্রসারণ চুক্তি লঙ্ঘন করার জন্য চীনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দেশের মধ্যে ANKUS চুক্তি নামে অভিহিত শেষবার সামরিক চুক্তি হয়েছিল ২০২১ সালে।

মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন...

১-এর পাতার পর—

বঞ্চিত হয়েই চলেন। মোদি সরকারের কোনও দুশ্চিন্তাই নেই এ প্রসঙ্গে।

মোদি স্বয়ং পশ্চাদপদ জাতিভুক্ত বলে দাবি করেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করার কিছুমাত্র কারণ নেই। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন প্রশ্নের ঊর্ধে নয়, তেমনই তাঁর জাতিগত পরিচয়ও। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, তিনি ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত তাহলে, তাঁর নিজের জাতির জন্যও কোনও অনুভূতি নেই বলেই মানতে হবে।

এমন বিপুল সংখ্যক উপার্জনহীন যুবক যুবতীরা কিভাবে বাঁচবেন? তাঁদের অনাগত ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা ভাবতেও ভয় হয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন মোদির দল এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একাংশকে দেশের নানা অংশে ঘাতক বাহিনীতে পরিণত করতে উদ্গ্রীব। লাভ-জেহাদ, গো রক্ষা, রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তী প্রভৃতি অছিলায় যারা খুনোখুনি মারামারি করে চলেছে তারা প্রায় সকলেই কর্মহীন অংশের মানুষ।

অতীতে ফ্যাসিবাদী বিশ্বত্রাস হিটলারের অপশাসনকালে বিশ্বমন্দার ব্যাপক প্রভাব ছিল জার্মানি বা অন্যান্য দেশে। বিপুল সংখ্যক নরনারী যথাযথ উপার্জনের অধিকার বঞ্চিত। এরা অনেকেই হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর সদস্য/সদস্যায় পরিণত হয়েছিল। চরম বেকারত্বের যন্ত্রণাবিদ্ধ বহু যুবক যুবতী ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা মৃত্যুপুরী বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে নিম্নমানের চাকুরি পেয়েছিল। চরম হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছে এরা। কমিউনিস্ট, ইহুদী এবং হিটলার বিরোধী মানুষদের অবলীলায় হত্যা করেছে। জার্মানির সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। আউসউৎভিস এর মতো বন্দিশালাগুলিতে কী নারকীয় বা মনুষ্যেতর পরিস্থিতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভুবন নির্মাণ করেছিল তা এখন অনেকেরই জানা। যুদ্ধে পর্যুদস্ত হবার পরে যে ইতিহাসখ্যাত ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল বা আন্তর্জাতিক বিচারশালা গঠিত হয়েছিল সেখানে এইসব জঘন্য কাজে যুক্ত অনেকেরই মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল তা-ও আমরা অবগত।

ভারতে যেভাবে, যে দ্রুততার সঙ্গে কর্পোরেট কমিউনালিজম বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী ফ্যাসিবাদের বিস্তার ঘটে চলেছে তা যে, হিটলার মুসোলিনীর মতো মানবতার শত্রুদের অনুকরণ করেই চলছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এস এস ও বিজেপি যে, 'মাইন ক্যাম্ফের' দর্শনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় সে প্রসঙ্গে কোনই সংশয় নেই। হিটলার যে, তৎকালীন জার্মানির বড় বড় শিল্পপতিদের সুবিধে করে দেবার জন্যই তাঁর ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন বহুজাতিক ব্যবসায়ীরাও হিটলারের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিল তা-ও সন্দেহাতীত-ভাবে সত্য।

মানবিকতার আসল শত্রু তো পুঁজিবাদ। নরেন্দ্র মোদি পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার্থেই সমস্ত নীতি গ্রহণ করেন। পুঁজিবাদই এক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়ে গণতন্ত্রের সমূল উৎপাটনে ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ভারতের সংঘ পরিবার একান্তভাবেই পুঁজিবাদের সহায়তা করতে এবং নিজের জন্য সুবিধে ফিরে পেতে বিশেষ উদ্গ্রীব। বেকারত্বের অবাধ বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদের পক্ষে সস্তা শ্রম পেতে এবং প্রবল নিরাপত্তাহীন জীবিকার মধ্যে মানুষকে বেঁধে রাখতে চায়। মানুষকে বেঁচে থাকার যান্ত্রিক সুযোগকেই বিশেষ বলে প্রচার করা হয়। মানুষও তাই মেনে নেয়।

সংকট যতই গভীর হবে ততই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের করাল আক্রমণে বিদ্ধ হবে সাধারণ জনসমাজ। ভীতির অবাধ প্রসার ঘটে চলবে। নিতান্ত বেঁচে থাকতে পারাটাই মানুষের কাছে সবিশেষ বলে মনে হবে। অন্যান্য যেসব মানবিক অধিকার রয়েছে তার সন্ধান করতেও মানুষ ভয় পাবে। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সংগঠিত করে উন্নত মনুষ্যজীবন নিশ্চিত করার পথে মানুষ সহজে হাঁটবে না। এই কঠিন কাজটি করতেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে ঋদ্ধ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীদের বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে হবে। অত্যাচারী শাসকই শেষ কথা বলবে না। এই প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয়েই আমাদের সমস্ত কর্মসূচি সাহসের সঙ্গে সংগঠিত করতে হবে।

মণিপুরে জাতি দাঙ্গা বেড়েই চলেছে

উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড় পর্বতঘেরা মণিপুরের অশান্তি চলছেই। মণিপুরের সরকার বিজেপি নিয়ন্ত্রিত। সেই সরকার অবশ্য সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্রশ্রয় দিয়ে চলে। আজ প্রায় মাসাধিক কাল জুড়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কুকি উপজাতির মানুষদের সঙ্গে মণিপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষদের সংঘাত চলছে। ইতিমধ্যেই জাতিদাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। মারা গেছেন প্রায় একশজনের কাছাকাছি সংখ্যার মানুষ। সরকারি হিসেবে অবশ্য ৭৪ জন। বিশ্বাস করার মতো যুক্তি নেই। অসংখ্য ঘরবাড়ি বসতি পুড়ে ছাই। প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো মানুষ বাস্তুচ্যুত। অনেকে আবার সীমান্ত অতিক্রম করে মায়ানমারে পালিয়ে গেছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এক দুঃসহ অবস্থা চলছে। রাজ্য সরকার অসহায়।

এই রাজ্যে আবার ডবল ইঞ্জিন সরকার। অপার মহিমা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর। মণিপুর রাজ্য যখন চরম হিংসায় দগ্ধ হচ্ছে সেইসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিস্তার ঘটাতে একাগ্রচিত্ত। কর্ণাটক নির্বাচনের প্রচার পর্বের শেষের দিকে টানা ১২ দিন অমিত শাহ সেখানে ঘাঁটি গেড়ে। মণিপুরে জাতি দাঙ্গা চলছে জেনেও কিছুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। সম্ভবত মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী অসহায় বীরেন সিং-এর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি শাহেনশাহ এবং শাহ।

ভোটপর্ব মিটে যাবার পরেও অমিত শাহ মণিপুরে যান নি। আসাম গেছেন কিন্তু সন্নিহিত রাজ্য মণিপুরে যাবার বিষয় ভাবেননি। এখন শোনা যাচ্ছে মহান মন্ত্রী আগামী ২৯ মে ইম্ফল যাবেন এবং সেখানে নাকি তিনদিন থাকবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লিতে তলব করে তাঁর ওপরেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল্লি নিষ্কলঙ্ক হয়েছে। সহায়তা বলতে মণিপুরে আসাম রাইফেলস-এর স্থায়ী ঘাঁটির সঙ্গে সেনাবাহিনীর টহলও চলছে। হিংসা ছড়িয়েছে ব্যাপক বেগে। চুড়াচাঁদপুর জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে। কুকিদের বাড়ি ঘর ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত। ওদের উপাসনা স্থলগুলি অর্থাৎ একাধিক গির্জা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই জেলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষরাও ক্ষতিগ্রস্ত। এখন তো হিংসা ছড়িয়েছে ইম্ফল পূর্ব এবং পশ্চিমে। তার সঙ্গেই মেইতেই প্রধান বিষ্ণুপুর জেলাও হিংসা কবলিত।

এই ক্ষুদ্র রাজ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ চলতে থাকা হিংসা ও বিদ্বেষের অপার বিস্তারে সাধারণ জনজীবন ভয়ানক সমস্যার মুখোমুখি। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দুষ্প্রাপ্য। দাম রেকর্ডচুম্বী। আলুর দাম প্রতি কিলো প্রায় একশ টাকা। চাল নেই। সব্‌জি পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারগুলি বস্তুত বন্ধ পড়ে রয়েছে। রান্নার গ্যাস ১৮০০ টাকা প্রতি সিলিন্ডারে। মানুষ বাঁচার পথ খুঁজতে দিশাহারা। রাজ্য সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে ডবল ইঞ্জিন। অসহায় বিলাপে মুহ্যমান।

জানা গেছে যে, ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে দু'চারদিনের মধ্যেই মণিপুরের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে ইম্ফল যাচ্ছেন। সব কিছু আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেবার উপদেশ দিচ্ছেন অমিত শাহ। তাঁর নির্দেশ ২৯ মে'র আগেই মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

জানা নেই সব মিটে গেলে শাহ আর দেশের মানুষের অর্থ বরবাদ করে ইম্ফল বেড়াতে যাবেন কেন? নতুন করে হিংসার ঘটনা ঘটছে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রবলভাবে বিঘ্নিত। মণিপুর রাজ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ চলতে থাকা ইনসারজেন্সির সমস্যা অর্থাৎ, যখন তখন গোলাবারুদ ব্যবহার করে জনজীবন ত্রস্ত করার ঘটনাও নতুন করে বেড়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ। সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে। মণিপুরে আরএসপি'র যতটুকু সাংগঠনিক অস্তিত্ব রয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বিজেপি প্ররোচিত হিংসার বিস্তার রুখতে যতটা সম্ভব ক্রিয়াশীল। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি একসঙ্গেই শান্তিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট।

বাঁকুড়া রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আলোচনা সভা

কবিপক্ষের শেষলগ্নে ২১ মে, ২০২৩ রবিবার ক্রান্তি শিল্পী সংঘ বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে বৈকাল ৫টায় বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলায় নেতাজী মূর্তির পাদদেশে অবস্থিত মুক্তমঞ্চে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও "মানবিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সারা দুপুর অসহ্য তাপপ্রবাহ থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়া শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রগতিশীল মানসিকতার প্রচুর শ্রোতা আড়াই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। কিশোর-কিশোরী শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন প্রবীণ শিল্পীর যোগদানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বিশেষ মাত্রা পায়। মানবিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে মূল আলোচনায় গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক ড. সৌমেন (সোমনাথ) রক্ষিত তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে ব্যাখ্যা করেন, সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা ও ভাববাদের ঊর্ধে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদী চিন্তাধারার মেলবন্ধনের অতুলনীয় পটভূমিতে, হাতেকলমে সেই দার্শনিক ভাবনার সফল রূপায়ণ কবির সারা জীবন জুড়ে কৃষিক্ষেত্রের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়, ধর্মে, সমাজবোধে, শিক্ষাক্ষেত্রে-সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্র জীবনের নানান ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেন, কীজন্য আমাদের প্রাণের কবি বিশ্বমানবিকতার এক অনন্য পূজারী হিসাবে বিশ্ব-জনমনে চির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার চোরাবালি থেকে বেরিয়ে এসে নবীন প্রজন্মকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ, গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে কবির মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, দেশ ও দশের জন্য গভীর চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে উপলব্ধি করবার পরামর্শ দেন তিনি।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনমানসে বিশেষ রেখাপাত করে। ক্রান্তি শিল্পী সংঘের মুখ্য সংগঠক অনাদি মাহাতোর সভাপতিত্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুস্মিতা পান্ডে বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতৃমন্ডলীর সাথে সংঘের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে গঙ্গা গোস্বামী, মদন মাহাতো, সুনীল পাত্র, শান্তনু অধ্বর্যু, পার্থ চেল প্রমুখ সর্বসময় উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করেন।

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের সভা কদমতলায়

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ২০ মে শনিবার শহরের কদমতলায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বক্তাদের অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার জনগণের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ। ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আগামী ৭ জুন এ সবের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিল হবে। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন কম. বিশ্বজিৎ সরকার, কম. আদিত্য জোতদার, কম. রাজেশ ঘোষ প্রমুখ।

সিউড়িতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জনসভা

১১ই মে ২০২৩, বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি বেণীমাধব স্কুল ময়দানে বাম-কংগ্রেস যৌথ উদ্যোগে জনসভা সংগঠিত করা হয়। সভা মঞ্চে আরএসপি'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কম. স্বপন কুমার রায়, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক কম. নরেন চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক কম. মহম্মদ সেলিম। প্রত্যেক বক্তাই তাঁদের বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা রকম দুর্নীতি (কয়লা, বালি, পাথর, গরু, বেকার যুবক-যুবতীদের মেধা বা চাকরি চুরি, আবাস যোজনার বাড়ি চুরি, ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি ইত্যাদি), নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে দুই সরকারের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করে মজুরি বৃদ্ধি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার দাবিতে সরব হন। পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রত্যেক বিরোধীদের নমিনেশনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা এবং স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন করা, নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলেন। উক্ত জনসভায় প্রায় ৭০০০-৮০০০ হাজার সভ্য-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়ায় গণসংগঠনের সভা

আজ হাওড়া জেলার আরএসপি'র পাঁচটি গণসংগঠনের ডাকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া বেলেপোল পার্টি অফিসের সন্নিকটে।

উক্ত প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাজ্য মহিলা সভানেত্রী কম. সর্বানী ভট্টাচার্য এবং ইউটিইউসি'র রাজ্য কমিটির সদস্য কম. তাপস বিশ্বাস, আর ওয়াই এফ-এর সদস্য কম. স্বপন মেইকাপ ও হাওড়া জেলা সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কম. দেবপ্রসাদ দে সরকার।

কর্ণাটকের নির্বাচন ফ্যাসিবাদী বিজেপি'র বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের সূচনা

কর্ণাটকে মুখের মতো জবাব পেয়েছে ক্ষমতায় মদগর্বী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন। প্রতিটি রাজ্যে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র প্রচারের মুখ ও মুখোশ নরেন্দ্র মোদি ধীরে ধীরে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মূলক প্রচার সম থেকে পঞ্চমে তুলে দেন। এ বিষয়ে তিনি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এই বিষাক্ত প্রচারের বলয়ে টেনে নেন বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবকদের। একটা বৃহত্তর দুর্বৃত্ত চক্রের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল গণভিত্তি গড়ে তোলাটাই এযাবৎকালের রণকৌশল রূপে ফলিত রাজনৈতিক অনুশীলনে পরিণত করেছেন নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী নেতৃত্ব। এবার কার্যত প্রচারের ঘূর্ণিঝড় তুলতে চেয়েছিলেন আত্মগর্বী প্রধামন্ত্রী উনিশটি জেলায় জনসভা ও অসংখ্য রোড শো'র মাধ্যমে। প্রায় ছোট বড় নয় হাজার সভা করেছে বিজেপি। যত নির্বাচনের দিন যত এগিয়েছে ততই, আগ্নেয়গিরির লাভার মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের সঙ্গে বহু ব্যবহৃত পাকিস্তান বিরোধিতার অবস্থান থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে দেশদ্রোহী চিহ্নিত করে কর্ণাটক সহ সমগ্র দেশের রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরিসরকে বিধ্বস্ত করেছে। সংবিধান ও নির্বাচন কমিশনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছে।

কার্যত পশ্চিম ভারতের গুজরাট, উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশ, উত্তর পূর্বের অসম, ত্রিপুরার মতো দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের সরকারি ক্ষমতা এবং সহযোগী শক্তি আর এস এস-বজরঙ দলের মাধ্যমে এক একটি বিশেষ মডেলে ফ্যাসিবাদী হিন্দু রাষ্ট্রের মানচিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাদের রাষ্ট্রীয় রণনীতি। স্বভাবতই এই রণনীতির উল্লেখযোগ্য উপাদান রূপে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান-এর অতিকেন্দ্রীয়করণের প্রক্রিয়া সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটাকে ভেঙে দেওয়াই নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের লক্ষ্য। তাছাড়া রাজ্যে রাজ্যে যেখানে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রতিটি সরকারই, শুধু রাজ্য কেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আকণ্ঠ দুর্নীতির বিষ পান করা সত্ত্বেও স্বশাসিত কেন্দ্রীয় নজরদারি সংস্থাগুলিকে শিকারি কুকুরের মতো লেলিয়ে দিচ্ছে একের পর এক বিরোধী দলের নেতৃত্বের দিকে। অন্যদিকে দেশবাসীর জীবন জীবিকা, চাকরি, কৃষক ও শ্রমিক কর্মচারীদের অজস্র সমস্যা, প্রকৃত উচ্চমান ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সর্বজনীন করণের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বিজেপি। উন্নয়নের ধারা বা প্যারাডাইম থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্বজনীন কাঠামোর অবশেষটুকুও বিলুপ্ত করতে চাইছে ফ্যাসিস্ট দল বিজেপি। প্রয়োজনে রাজ্যপাল উপরাজ্যপাল বিজেপির নিষ্প্রাণ ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এইসব জঘন্য সংবিধানবিরোধী অপকর্ম করছেন আরো কোনো বৃহত্তর লোভলালসায় তাড়িত হয়ে।

কর্ণাটককে দক্ষিণ ভারতের দুর্নীতির এবং সেকুলারিজমের সর্বনাশকারী রাষ্ট্রীয় প্রকল্প রূপে অতিদ্রুত যেভাবে বদলে দিতে চাইছিল তা বিশদ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এই নির্বাচনে যতটা না কংগ্রেসের, তার থেকেও বেশি কৃতিত্ব দিতে হয় কর্ণাটকের জনসমাজের। তাঁদের সুচেতনাবোধের বাস্তব প্রতিফলনের। একথা অনস্বীকার্য যে, কর্ণাটকে জাতীয় কংগ্রেসর নেতৃত্বের টানাপোড়েনের সমস্যা সাময়িক সমাধান করে একটা নির্বাচন কেন্দ্রিক যৌথ নেতৃত্ব অনেকটা তৃণমূল স্তরে বামপন্থীদের ধাঁচে ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই বিষয়টিতে জাতপাত সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৈনন্দিন জীবনচর্যার বাস্তব সমস্যা সমাধানের পক্ষে সম্মতি নির্মাণে ভীষণ পরিণত ও ইতিবাচক অনুঘটকের কাজ করেছে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা। বিজেপি এবার চূড়ান্ত অসৎ ও অনৈতিক উপায়ে রাজ্যপালের সহায়তায় অর্থ আর বাহুবলের সন্ত্রাসে বিরোধী দলের বিধায়কদের ক্রয় করার যে নজির রেখেছে তার পূর্বতন সমস্ত দৃষ্টান্ত শুধু ছাপিয়েই যায় নি, এভাবেই বিজেপি আঞ্চলিক দল জে ডি এসকে তাদের পোষ্যে পরিণত করে দলটির আঞ্চলিক ভাবপ্রবণতা নির্ভর শক্তির ক্ষয়রোগ ত্বরান্বিত করেছে। অন্যদিকে হিজাব বিতর্ক উত্থাপন করে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশ নির্মাণ করেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে এসে কংগ্রেসের সরকার গঠিত হলে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে বলে রাজ্যবাসীকে সন্ত্রস্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, ভোক্কালিগাদের সঙ্গে টিপু সুলতানের সাময়িক বিরোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা অস্বীকারের মাধ্যমে ইতিহাসের বিকৃতি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছেন। উদ্দেশ্য ভোক্কালিগাদের ভোটের উপর দখলদারি। এই দুরভিসন্ধিও বুঝতে পেরে সমুচিত চপেটাঘাত করেছেন কর্ণাটকবাসী।

আসলে ফ্যাসিবাদ চারপাশের আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার নিরন্তর গতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ। নিজেদের নির্মিত পূতিগন্ধময় গর্ভগৃহ প্রসারিত করাই এদের কাজ। না হলে কর্ণাটকের নির্বাচনের প্রাক্কালে কাশ্মীর ফাইলস এবং কেরালা স্টোরি নিয়ে মাতামাতি আর গুজরাটের দাঙ্গা বিষয়ক বি বি সি'র তথ্যচিত্র বিজেপি সরকার বাতিল করত না।

কর্ণাটকের সচেতন মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সর্বনাশ করার চক্রান্ত বুঝে গিয়েছিলেন যখন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত রাজ্য সরকারের ডেয়ারী প্রকল্প নন্দিনীকে সরাসরি কেন্দ্রীয় ডেয়ারী প্রকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় ''ডাবল এঞ্জিন'' বিজেপি'র সরকার। সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিফলিত হয়েছে ভোটের বাক্সে। নরেন্দ্র মোদির বুক বাজিয়ে চিৎকার, বজরঙবলী অর্থাৎ পবনপুত্র হনুমানের জন্মস্থান কর্ণাটকে দেবতার আশীর্বাদে সত্তর ভাগ আর বজরঙ দলকে সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের জন্য রাহুল গান্ধীর কণ্ঠে বেআইনি করার ঘোষণার প্রতিবাদে বজরঙ দল নাকি বাকী ত্রিশভাগ জয় ছিনিয়ে আনবে। নিজেই প্রহসনের নায়ক হয়ে নির্বাচন বিধি ভেঙেছেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে।

তাই কর্ণাটকে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ জয় ও বিজেপি'র পরাজয় এবং স্থানীয় নীতিনৈতিকতাহীন আঞ্চলিক দল জে ডি এসের সাংগঠনিক অবক্ষয় রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্তত সংসদীয় পরিসরে একটা বৃহত্তর ন্যারেটিভ নির্মাণ করেছে। মানুষ যদিও ইতিহাসের কারিগর, তবুও সে নিজে যেভাবে প্রত্যাশা করে সদাসর্বদা সেভাবে ঘটে না। সময়ের গতিকে, তার দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ করতে হয়।

এখনো স্পষ্ট নয়, এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট শক্তি থমকে দাঁড়াবে, না পথ বদলে আরো আগ্রাসী রূপ নেবে। তবে শুধু সংসদীয় পরিসরে নয়, বিচার ব্যবস্থা ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা অপশক্তির হাত থেকে মুক্ত করার দিকে এগিয়ে চলেছে। দিল্লির উপরাজ্যপালের অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমি ও আইন শৃংখলা ছাড়া সমস্ত প্রশাসনিক অধিকার রাজ্য সরকারের, সে যত ছোট রাজ্যই হোক না কেন। এই রায় দিয়েছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। কর্ণাটকের পরাজয়, শীর্ষ আদালতের রায় সত্ত্বেও এতই একার্থে ভীত ও বাহুবল প্রদর্শনে আগ্রহী সরকার পুতুলসম রাষ্ট্রপতির কলমের মাধ্যমে শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারি করেছে বিজেপি সরকার। আর মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল কড়া ভাষায় সমালোচিত হয়েছেন শীর্ষ আদালতে তাঁর অধিকারে সীমা লঙ্ঘন করে অতিসক্রিয়তার সঙ্গে সংবিধানের ফেডেরাল কাঠামো না মেনে একটি নির্বাচিত সরকারের বদলে অন্য সরকার গঠনের অনুমতি দেবার জন্য।

কর্ণাটকে এবার যে কংগ্রেসের ভোট বিজেপি'র তুলনায় ৯ শতাংশের বেশি হবে এক আধটা বাদে অধিকাংশ প্রচার মাধ্যমে সেই ধরনের ইঙ্গিত ছিল। এই সব সমীক্ষার মধ্যে এডিনা নামক সমীক্ষাকারী গোষ্ঠী যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক কাঠামো অর্থাৎ, রাশি বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দিয়ে একেবারে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে ২০৪টি কেন্দ্রের ৪১১৬৯ জন ভোটারের মতামত সম্বলিত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এঁদের সংগৃহীত তথ্যে শ্রেণিদৃষ্টি ভঙ্গিতে বিভিন্ন দলের প্রতি সমর্থনের একটি মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়।

কৃষকের আত্মহত্যাপ্রবণ কর্ণাটকের কৃষিজীবী সমাজের মনে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে এবারের বিধানসভার ভোট। তাছাড়া করোনা কালের অসহনীয় দুর্দশা, আই টি সেক্টর ছাড়া আর সেধরনের শিল্পায়নও হয় নি। কর্ণাটকের কৃষক সমাজের কাছে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শ্রমিক কৃষক দলিত আদিবাসীদের ধর্মঘটের প্রভাবে বিজেপি সরকারের বহুশ্রেণিসমন্বিত লিঙ্গায়েত ভোক্কালিগা ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছুটা একপাথুরে ঐক্য ভেঙে দিয়ে জে ডি এস আর বিজেপির গণভিত্তিতে চিড় ধরিয়েছে। এছাড়া কর্ণাটকের নির্বাচনকে দেশের সেকুলারিজম আর ডেমোক্রেটিক মূল্যবোধে প্রত্যয়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ধর্ম জাতপাত ভাষাভাষী মানুষ এই ভোটকে ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের সংসদীয় ভোটের লিটমাস টেস্ট হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। বহু এন জি ও এবং সমাজকর্মী বড় সভার বদলে অনেকটা বামপন্থীদের ধাঁচে কংগ্রেস কর্মীরা বুথ স্তরে দরজায় দরজায় প্রচার করেছে।

ভোটের আগের দিন সমাজকর্মী ও ভোট বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদবের বক্তব্যে বিষয়টি বোঝা যায়, ''বিজেপি'র জয় মানে ঘৃণা, হিজাব, লাভ জেহাদের বার্তা সারা দেশে বিষাক্ত পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা। আজ কর্ণাটকের নির্বাচন মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এখানে এবার খেতমজুর আর দিনমজুরের ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি ২৯ শতাংশ। পরিকাঠামোর কাজ বিজেপির মন্ত্রীদের কমিশনের চাপে ঠিকাদারদের কাজ বন্ধ হওয়ায় নির্মাণ শ্রমিকের অধিকাংশ বেকার। এখানে উচ্চ মধ্যবিত্ত মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ। এই শ্রেণির ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস ৩০ শতাংশ। মধ্যবিত্ত মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। এঁদের ভোট উভয় দলই পেয়েছে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। আর নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র হতদরিদ্রদের, তাদের ভোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭ শতাংশ, অধিকাংশই পেয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ইস্তাহারে জন কল্যাণমূলক প্রকল্প, সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ আবার চালু করা ইত্যাদির মাধ্যমে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে শ্রেণিভিত্তিক প্যারাডাইম বা নকশার ঝোঁক স্পষ্ট। যদিও কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের যৌথ দায়বদ্ধতা বিজেপি'র অন্তর্কলহের তুলনায় ভীষণ ইতিবাচক ভূমিকার কাজ করেছে। আর একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, রাহুল গান্ধী যেভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতো গজদন্ত মিনারবাসী না হয়ে ভারত জোড়ো যাত্রায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে সহযাত্রী করে শুধু মাত্র বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার সমস্যা তুলে ধরেছেন, যে দশটি জেলার মধ্য দিয়ে পদযাত্রা হয়েছিল, সেখানে তো বটেই, অন্যত্রও এর অনুঘটকের ইতিবাচক লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে সংঘ পরিবারের অক্টোপাস সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের সমাজকে আক্রমণ করছে। বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশ কমেনি। শুধু তাই নয়, উডুপি সমেত উপকলবর্তী পাঁচটি আসনেই বিজেপি জিতেছে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ আর চূড়ান্ত দুর্নীতির বিষবৃক্ষ এখনও বেঁচে আছে। ডালপালা মেলছে। কর্ণাটকের মানুষ তবুও তো বহুদিন পরে রামমনোহর লোহিয়ার ভাবশিষ্য দেবরাজ উরসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, লিঙ্গায়েত ভোকালিগা নির্বিশেষে দলিত সংখ্যালঘু পশ্চাৎপদজাতি ও দরিদ্র মানুষের মঞ্চ অহিন্দার পুনর্জাগরণের পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিকৃতমনা বিজেপি নেতৃত্ব সহ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে বিশাল বিশাল লিঙ্গায়েত আর ভোকালিগা নেতাদের মূর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী নিজের দিকে ঝোল টেনে বজরঙ দলের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় গণসম্মোহন ব্যর্থ করতে পেরেছেন কর্ণাটকের খেটেখাওয়া মানুষ।

সুতরাং সর্বভারতী রাজনীতিতে আবার দেশের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার সংগ্রামের পক্ষে একটা ব্যাপক জনসমর্থনের ইঙ্গিত লক্ষ করা যাচ্ছে। হয়তো বা বাম গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে আন্দোলনের শীর্ষে ওঠার সুযোগ দ্রুত চলে আসবে। ইতিহাসের সেই উপহার গ্রহণ করার মতো সাংগঠনিক শক্তি এবং অনুশীলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে খেটেখাওয়া মানুষের সহযোদ্ধা বামপন্থীদের।

Vol. 70 Issue No. 31 শনিবার, ২৭ মে ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

মোদির কীর্তি ভারতকে অবনত করছে

ভারত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা বিগত নয় বছরে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে প্রায় খাদের কিনারে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক পথে দেশের কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারগুলি পরিচালন ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির আস্ফালনে বিপর্যস্ত। গণতন্ত্রের ধাত্রী বা মাতৃরূপ সরকারি ক্ষমতার দম্ভের কাছে অবনত হয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর্মসূচি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জয়গানের উচ্চকিত রবে বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি আরও সুউচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণের অর্থে নির্মিত সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন মোদি স্বয়ংই করবেন। তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য কোনো সদস্য কোনও অধিকার পাবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় সর্বব্যাপ্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির কাছেই পুরোপুরি ন্যস্ত। এমন কি, মোদির নির্বাচনী কেন্দ্র বেনারস এবং সন্নিহিত অঞ্চলে কোনও রাস্তার মেরামতি বা কোনও সরকারি দেওয়াল নতুন করে রং করলেও তার সমারোহপূর্ণ উদ্বোধন হচ্ছে। উদ্বোধকের ভূমিকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা বিভাগীয় মন্ত্রীদের কোনও স্থান নেই। তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হচ্ছে না। এক অরণ্যদেবই জঙ্গলের অধিকর্তা। তিনি ছাড়া ভুবন অন্ধকার।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়লেও যতটুকু হচ্ছে তার সব কৃতিত্বই নরেন্দ্র মোদির শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে কোনও অভিনবত্ব আর নেই। ২০১১'র পর থেকে এই রাজ্যে যতটুকু কাজ হয়েছে সবকিছুরই উদ্বোধনে নিশ্চিতভাবেই মমতা ব্যানার্জীর নাম খোদাই করা থাকছে। রেলের টিকিট কাটার জন্য যে অফিস প্রায় বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছর যাবৎ স্থায়ীভাবে রয়েছে, সেই অট্টালিকায় নতুন রং করে উদ্বোধকের নাম খোদিত আছে একদা রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখল করার পর থেকে শৌচালয় থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পর্যন্ত সব কিছুর উদ্বোধক হিসেবে একটা নামই জ্বলজ্বল করছে। এই রাজ্যে একটি চালু কথা, রাজ্য সরকারের একটাই পোস্ট বাকী সবাই ল্যাম্পপোস্ট। কৌতুহল স্বাভাবিক যে এই রাজ্যেও সড়ক নির্মাণ বা ছোটখাটো হাসপাতাল উদ্বোধনে একমাত্র মমতা ব্যানার্জীর নামই উদ্বোধক হিসেবে থাকবে কেন? ২০১১ থেকে মমতা ব্যানার্জী যা করেছেন তার কোনও নজির অতীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোদি ও মমতার দৈনন্দিন আচরণের পদ্ধতি একই সূত্র থেকে স্থির হচ্ছে।

২০১৪ পরবর্তী ভারতের মানুষ একই অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও একটাই পোস্ট বাকী সবাই আজ্ঞাবহ। দেশের মানুষ জানতেই পারেন না বর্তমান ভারতে কোন মন্ত্রকের মন্ত্রীর নাম কী! এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই মোদির উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংঘ পরিবারের প্রযোজনায় অন্ধভক্তের দল উদ্‌বাহু প্রচার করছেন যে, নরেন্দ্র মোদি এক ৫৬ ইঞ্চি ছাতি বিশিষ্ট মহামানব। তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের অমিত বলশালী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এখন তাঁকে ভগবানের অবতার হিসেবে দেখানো জন্য দ্বিগুণ বা দশগুণ বেগে ভক্তরা প্রচার চালাচ্ছেন। কর্ণাটক রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মোদির এমন কল্পিত ভাবমূর্তি চরম ধাক্কা খেলেও লজ্জাশরমহীন ভক্তকূল আদৌ থেমে থাকছে না।

সম্প্রতি মোদি কয়েকদিনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় সরকারি সফরে গিয়েছিলেন। দিল্লি এবং সিডনির দূরত্ব মোদির বিশেষ বিমান যা, করোনা অতিমারিকালে দেশের অজস্র মানুষের মৃত্যুমিছিলের সময়ে প্রায় আট হাজার কোটি টাকায় কেনা হয়েছিল, সেই বিমানে বিলাসবহুল যাত্রা শেষে মোদি দেশে ফিরে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্স মারফৎ 'বন্দে ভারত' ট্রেনের উদ্বোধন করলেন পতাকা নেড়ে। ভক্তকূল এবং গোদী মিডিয়া উচ্ছ্বল নৃত্য করে বলতে শুরু করলো—মোদি বলেই এতদূর বিমান যাত্রার পরেও বিশ্রাম না নিয়ে সবুজ পতাকা হাতে ট্রেন যাত্রার উদ্বোধন করলেন। ভারতের অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী এমন করতেই পারেন নি। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অবশ্য বুঝতেই পারবেন যে, মাত্র সাত-আট ঘণ্টার বিলাসবহুল বিমান যাত্রার পরে নিজের অতিবিলাসে উপচে পড়া আয়োজন সমৃদ্ধ বাসস্থান থেকে এমন সবুজ পতাকা নাড়ানো কোনো বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় নয়। নির্লজ্জতার রেশ মাত্র এই স্বৈরশাসকের নেই।

স্মরণে আছে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি দখলের পরেই মুম্বাই থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত অত্যাধুনিক বুলেট ট্রেন চালু করবেন বলে প্রগলভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র তাই নয়, জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে সঙ্গে নিয়ে বুলেট ট্রেনের যাত্রাপথ পরিদর্শন করে প্রযুক্তিগত সহায়তার চুক্তি পর্যন্ত হয়ে গেছে বলে প্রচার করেছিলেন। দেশের অনেক মানুষ মোদির এমন প্রচারে হয়তো বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সে সব নিতান্তই জুমলা বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল। মানুষ হয়তো এখন সেসব মনেও রাখবেন না। অতএব মোদির মতো খল প্রশাসক নতুন প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করলেন—অন্ততপক্ষে ৭৫টি উচ্চ গতিসম্পন্ন 'বন্দে ভারত' ট্রেন চালু করবেন। নতুন এই ট্রেনগুলিতে বিলাসবহুল ব্যবস্থাসমেত ১৬টি করে বগি থাকবে। মানুষের যাতায়াত অনেক অনায়াস হবে।

প্রতিশ্রুত সময়কাল পেরিয়ে গেছে যথারীতি। এতাবৎ মাত্র ১৭টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উচ্চ আয়ের মানুষদের জন্য চালু হয়েছে। ১৬র পরিবর্তে মাত্র ৮ বগি সম্পন্ন ট্রেন।

মোদি স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেসগুলি প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিমি বেগে চলবে। আবার জুমলা। কোনক্রমে চালু হওয়া ট্রেনগুলির গতিবেগ মাত্র ৬৪ কিমি/ঘণ্টায়। অর্থাৎ বেশ ধীরগতির ট্রেন। উচ্চমূল্যের টিকিট কেটে মানুষ যাত্রা করবেন। মানুষের কথা কে ভাবে!

যতদূর স্মরণে আছে ভারতের বর্তমান রেলমন্ত্রীর নাম অশ্বিনী বৈষ্ণব। সাধারণভাবে রেলযাত্রার উদ্বোধন এদেশে রেলমন্ত্রীই করতেন। অদূর অতীতেও তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অনেকগুলি ট্রেনের উদ্বোধন করেছিলেন। ড. মনমোহন সিং থাকেন নি। এমনকি, মমতা ব্যানার্জী যখন আর এস এস-এর প্রশংসাধন্য হয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী, তখনও কোনও ট্রেনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে দেখা যায় নি। মোদি জমানায় সেসব রীতি হারিয়ে গেছে। এখন ট্রেন উদ্বোধনও একমাত্র মোদি করবেন। বেচারা অশ্বিনী বৈষ্ণব! তাঁর অস্তিত্ব শুধুমাত্র দিল্লির রেলভবনেই সীমিত। এ পর্যন্ত যে ১৭টি বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন হয়েছে, তার মধ্যে ১৬টির উদ্বোধন করেছেন মোদি স্বয়ং। আর একটির উদ্বোধনে ছিলেন মোদির 'ম্যান ফ্রাইডে' বা ঘনিষ্ঠতম সাঙ্গাৎ অমিত শাহ। মোদি সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের অবতার এবং সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে সক্ষম। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো নেতার তুলনাই হয় না।

এই ধরনের কথা আমরা অতীতে বঙ্গেশ্বরী মমতা ব্যানার্জীর প্রচারেও শুনেছি। তিনি দাবি করতেন, দিনে ২২ ঘণ্টা তিনি কাজ করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন। সেই সময় রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দলনেতা (যিনি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও) মমতা ব্যানার্জীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এত পরিশ্রম করলে মাথায় গণ্ডগোল হবার বিশেষ সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী যেন এত পরিশ্রম না করেন। বিগত প্রায় ১৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গের কী উন্নয়ন হয়েছে তা সকলেই জানেন। মমতা ব্যানার্জী আর সেসব আজগুবি দাবি করেন না।

মোদির বদান্যতায় ভারতের কী উন্নয়ন হচ্ছে তা-ও মানুষ দেখছেন এবং সম্যক উপলব্ধি করতে পারছেন। একজন মহিলা জুমলাবাজ অন্যজন পুরুষ। এছাড়া এই দুই স্বৈরতন্ত্রীর মধ্যে আর কোনও ফারাক নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কৌশলগত দিক দিয়েই মমতা ব্যানার্জী ও নরেন্দ্র মোদি একই বিন্দুতে অবস্থান করেন, এমন নয়। প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রেও এই দু'জন স্বৈরতন্ত্রী একইভাবে ক্রিয়াশীল। ভারতের বাইরের কোন রাষ্ট্র থেকে এদের কাছে নির্দিষ্ট নির্দেশ আসে বলে মনে করা অপরাধ নয়, আশ্চর্যের তো নয়ই।

নির্বাচন কমিশনে আরএসপি'র ডেপুটেশন

আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সুভাষ নস্কর ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. রাজীব ব্যানার্জী গত ২৬ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা রাজ্যের দুর্গাপুর, হাওড়া পৌর নিগম সহ ১৫টি পৌরসভা এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলির নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও দলের পক্ষ থেকে পেশ করেন।

প্রত্যুত্তরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আর এস পি'র প্রতিনিধিদের জানান, দীর্ঘকাল বকেয়া হয়ে যাওয়া পৌর নির্বাচনগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। রাজ্যের আইন অনুযায়ী এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্মতিপত্র না পেলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন নিজের উদ্যোগে কিছু করতে অপারগ। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে কমিশনার জানান, আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতের মেয়াদের সময়সীমা হল শপথ গ্রহণের শেষ সময়কাল। তদনুযায়ী বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেয়াদ ঐ আইন অনুযায়ী আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত থাকছে। তবে প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকার তা এগিয়েও নিয়ে আসতে পারে, যেমনটি গতবার সরকার করেছিল বলে তিনি দলীয় প্রতিনিধিদের জানান। রাজ্যের তফসিল জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিরোধীরা যাতে প্রার্থী না দিতে পারে সেই অভিসন্ধির কথা প্রসঙ্গে কমিশনার জানান, নির্বাচনের সময়কালে বিরোধী দলও যাতে নির্বিঘ্নে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারে তার জন্য প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এতদসত্ত্বেও, যদি কোনও সমস্যা কোথাও হয় তাহলে তা নির্বাচন সংক্রান্ত সময়সীমার ভিতরে কমিশনের নজরে আনা হলে কমিশন তৎক্ষণাৎ তা সমাধানের ব্যবস্থাও করবে। এছাড়া ভারতের নির্বাচন কমিশনের আইন অনুযায়ী আমাদের দল পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য দলের স্বীকৃতি হারিয়েছে। তাই, আসন্ন পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিতে আমাদের দলের প্রার্থীরা যাতে কোদাল-বেলচা চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে সে ব্যাপারে আবেদন জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি পত্রও গত ২৬ মে জমা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোনও অসুবিধা হবে না বলেই বোধ হয়েছে।

মাননীয় কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন, কলকাতা

বিষয় : পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত

মহাশয়,

আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে, আমাদের রাজ্যের দুর্গাপুর, হাওড়া পৌর নিগম সহ বেশ কয়েকটি পৌরসভার নির্বাচনের সময় দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তা সম্পন্ন করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমাদের দাবি :

● এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে পৌর নির্বাচন সম্পর্কিত যে আইন রয়েছে তার ভিত্তিতে বকেয়া নির্বাচনগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ কমিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া হোক।

● রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গৃহীত হয়ে থাকলে কমিশনের নিরপেক্ষতার স্বার্থে সর্বদলীয় সভা করে রাজ্যের মানুষকে তা জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেয়াদ মে মাসেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু, এই ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদাসীন মনোভাব আমরা লক্ষ করেছি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বেই যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাই রাজ্যের সকল ভোটারের ন্যায় আমরাও এই ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী।

তাই, আপনার কাছে আমাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি কবে নাগাদ শুরু করা হবে তা রাজ্যবাসীকে জানানোর উদ্যোগ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক।

পাশাপাশি, গত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যেভাবে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল তা বন্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের দাবি :

● আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে অন-লাইনে মনোনয়ন জমা করার প্রক্রিয়া চালু করা হোক।

● অন-লাইনে যাঁরা মনোনয়ন জমা করবেন তাঁরা যাতে উক্ত নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত সামিল থাকতে পারেন তার জন্য সবরকম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।

● ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তীতে গণনার সময় যে স্বৈরাচারী পথ রাজ্যের বর্তমান শাসক দল নিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি আটকাতে এখন থেকেই কমিশন তৎপর হোক।

● নির্বাচনে তফসিল জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিরোধীপক্ষের প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নের সময়ে যথাযথ শংসাপত্র দাখিল করতে না পারে তার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক আধিকারিকরা এস সি/এস টি-দের শংসাপত্র দিতে ঢিলেমি মনোভাব দেখাচ্ছেন বলেই আমাদের আশঙ্কা। অথচ, আমরা প্রত্যক্ষ করছি রাজ্যের শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদত যারা পাচ্ছেন তাদের ঐ শংসাপত্র পেতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। তাই, আমাদের আবেদন, তফসিল জাতি ও উপজাতি অংশভুক্ত সকল আবেদনকারীরা আবেদনের সাথে সাথেই যাতে শংসাপত্রটি হাতে পান তার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকেও উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কারণ, এই বিষয়টির সাথে পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিরও একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

আমরা আশা রাখি, আমাদের উত্থাপিত দাবিগুলরি প্রতি আপনার নেতৃত্বাধীন রাজ্য নির্বাচন কমিশন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে তৎপর হবেন। ধন্যবাদান্তে,

(তপন হোড়)
সম্পাদক, আর এস পি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
২৬.০৫.২০২৩

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-